- পহেলা বৈশাখ
- সাদা-কালোয় অপরূপ পাখি দুধরাজ
- গুগল : পড়ে শোনাবে ওয়েবসাইট
- বাবর আজম ব্যাটিংয়ের নতুন নক্ষত্র
- উপন্যাস : জীবনযুদ্ধের গল্প

সর্বাধিক প্রচারিত শিশু-কিশোর মাসিক

নতুন কিশোর কণ্ঠ

এপ্রিল ২০২০

গ্রামবাংলার ছনের ঘর

সর্বাধিক প্রচারিত শিশু-কিশোর মাসিক

নতুন কিশোরকণ্ঠ

বর্ষ ১৭ ■ সংখ্যা ২

এপ্রিল ২০২০
বৈশাখ ১৪২৭
শাবান ১৪৪১

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

নির্বাহী সম্পাদক
রাজিবুর রহমান

সহকারী সম্পাদক
তোফাজ্জল হোসাইন
আবিদ হাসান

দাম ২০ টাকা

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে মতিউর রহমান আকন্দ কর্তৃক ৫১, ৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং হক প্রিন্টার্স, ২১০ ফকিরাপুল, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : নতুন কিশোরকণ্ঠ, ৫১, ৫১/এ (৭ম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৭২৩৬
kishorkantha@yahoo.com
www.kishorkanthabd.com

কুরআনের আলো

কেউ ছোট নয়

সেদিন বিকেলে, ছোটভাই ইরফানের সাথে তারেক হাসানও খেলার মাঠে গিয়েছিল। সারা মাঠজুড়ে ঘাসের গালিচা। একদিকে সবুজের মায়া, অন্যদিকে নরম রোদের ঝিকিমিকি। সাথে আছে বাসন্তী হাওয়া। ভীষণ ভালো-লাগায় মনটা হয়ে উঠেছিল ভালোবাসাময়!

ইরফানের কিছু সহপাঠী-বন্ধুও এসেছে মাঠে। তারেক ভাবল, তাদের সাথে ভাব জমানোর এই তো সময়!

তাদের নিয়ে মাঠের এক কোণে, ঘাসের ওপর বসে পড়ল সে। এই কথা, সেই কথার বাঁকে বাঁকে তারেক তাদের শোনাতে লাগল নানা রঙের গল্প। জীবন গড়ার সোনালি উপদেশ। সবাই এতটাই মুগ্ধ, খেলার কথাই ভুলে গেল শেষে!

হঠাৎ ইরফানের চোখ গেল মাঠের অন্য প্রান্তে। খিলখিল করে হেসে উঠল সে। সবার মনোযোগ এখন সেদিকেই। হেসে উঠল অন্যরাও। তারেকও তাকাল। দেখল, একটা ছেলে– যার এক হাত নেই কিন্তু অন্য হাতে সে বোলিং করছে। ইরফান ও তার বন্ধুদের কাছে এ দৃশ্যটাই হাস্যকর মনে হয়েছে। ভাবখানা এমন, ওর আবার খেলা কিসের!

তারেক আবার কথা শুরু করল। বলল, ওই ছেলেটাকে নিয়ে আমরা হাসছি কেন? সে-তো চেষ্টা করছে, নিজের দুর্বলতাকে জয় করার। সবার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার। আচ্ছা, সে-কি আমাদের প্রেরণার উৎস হতে পারে না? একবার মহানবী (সা) প্রভাবশালী কুরাইশ নেতাদের সাথে বৈঠক করছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ সাহাবি তার কাছে এলে তিনি একটু ভ্রু কুঁচকালেন। ওই সাহাবির প্রতি তার অবজ্ঞা ছিল না, কমতি ছিল না ভালোবাসারও। তবুও, আল্লাহ তায়ালা বিষয়টা পছন্দ করলেন না। আয়াত নাজিল করে বললেন, "সে ভ্রু কুঁচকাল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। কারণ, তার কাছে অন্ধ লোকটি এসেছিল। তুমি কিভাবে জানবে, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো!" (সূরা আবাসা : ১-৩)।

তারেক বলল, দেখো, আল্লাহ তার রাসূলকেও কত কঠিনভাবে বলেছেন। অথচ, তিনি কোনো ভুল করেননি। আর আমরা যেটা করেছি, তা-তো রীতিমতো অন্যায়! জেনে রাখো, মানুষ সম্মানিত হয় তাকওয়ার মাধ্যমে, অন্য কিছুতে নয়।

ইরফান বলল, আজ থেকে আমরা কাউকেই ছোট ভাববো না। তার বন্ধুরাও সুর মেলালো একসাথে।

– বিলাল হোসাইন নূরী

চুপ থাকার রূপকথা

কথা যেন থামছেই না। সবার মুখেই কথার খই ফুটছে। কে কার কথা শুনছে, তা-ও বুঝা যাচ্ছে না। উস্তাদ আমিনুল ইসলাম কখন যে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, ছাত্ররা কেউ-ই বুঝতে পারেনি। তিনি সালাম দিলেন। সবার কোলাহল থামলে মুচকি হেসে তিনি বললেন, চলো আমরা কথা বলি 'কথা' নিয়েই! কিছু কথা হাসনাহেনার মতো সুবাসিত। ভালোবাসাময়। আর কিছু কথা মানুষকে বিপথগামী করে। কলুষিত করে আমলনামা। এজন্য আমাদের মেপে মেপে কথা বলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বেশি কথায় বেশি ভুল!

আহমদ দাঁড়াল। বলল, উস্তাদ! তাহলে তো আমাদের সবসময় চুপ করেই থাকতে হবে!

উস্তাদ বললেন, তা-ই করতে হবে প্রয়োজনে। চুপ থাকাও এক ধরনের অলঙ্কার। যা তোমাকে সুশোভিত করবে। ইমরান ইবনে হিত্তান (রা) বলেন, আমি একবার আবু জার গিফারি (রা) এর কাছে এলাম। তাকে কালো কাপড় পরে মসজিদে একাকী বসে থাকতে দেখলাম। বললাম, কেন এই নির্জনতা? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি– 'খারাপ বন্ধুর চেয়ে একাকী থাকা উত্তম। ভালো বন্ধু, একাকিত্ব থেকে উত্তম। ভালো কথা শেখানো, চুপ থাকা থেকে উত্তম। খারাপ কিছু শেখানোর চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।' (বায়হাকি)

উস্তাদ বললেন, এ হাদিস তোমাদের সবার মনে রাখা প্রয়োজন। সাঈদ বলল, উস্তাদ! এ হাদিস সুন্দর করে লিখে আজই ঝুলিয়ে রাখব বাসার দেয়ালে। উস্তাদ খুশি হয়ে বললেন, তুমি তো আবার অঙ্কনশিল্পী! তোমার তুলির পরশমাখা হাদিসটি আমাদের শ্রেণিকক্ষেও তো থাকতে পারে, না-কি? সবাই সুর মেলালো উস্তাদের সাথে। সাঈদ বলল, ইনশাআল্লাহ।

উস্তাদ বললেন, চুপ থাকার মর্যাদা রূপকথাকেও হার মানায়। মহানবী (সা) বলেছেন, নীরব থাকলে যে সম্মান অর্জিত হয়, তা ষাট বছর নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। (বায়হাকি)। শুধু তা-ই নয়, কেউ চুপ থাকলে শয়তান তার কাছে আসতে পারে না।

আহসান বলল, এখন থেকে আমরা ভালো কথা বলব, নয় চুপ থাকব ইনশাআল্লাহ। উস্তাদের মুখেও হাসি ফুটল, ভালোবাসার।

– বিলাল হোসাইন নূরী

গ্রামবাংলার ছনের ঘর
আবদাল মাহবুব কোরেশী ১২

পহেলা বৈশাখ
মামুন মাহফুজ ২০

কিশোর উপন্যাস
জীবনযুদ্ধের গল্প
দেলোয়ার হোসেন ২৮

ছড়া-কবিতা
আশরাফ আল দীন ৮
আবুল হোসেন আজাদ ৯
মাহমুদুল হাসান নিজামী ১১
লতিফা আজাদ পুষ্প ৪৯
আয়িশা জান্নাত আনিসা ৪৯

গল্প
কাশীতে না ফাঁসিতে
এম শায়েস্তা খান ২৫
পথের সন্ধানে
নাবিউল হাসান ৬১

স্বপ্নমুখর জীবন
শিকড় থেকে শিখরে
আমিনুল ইসলাম ফারুক ৫৬

আইটি কর্নার
গুগল ভয়েস অ্যাসিসট্যান্ট : পড়ে শোনাবে ওয়েবসাইট ■ শরীফ তাজওয়ার ৫৪

বিজ্ঞান ও বিশ্ব
রঞ্জন রশ্মি : আল জাবির ৬৬

চিত্র-বিচিত্র
সাদা-কালোয় অপরূপ পাখি দুধরাজ
জাহিদ ইকবাল ৭২

খেলার চমক
বাবর আজম ব্যাটিংয়ের নতুন নক্ষত্র
আবু আবদুল্লাহ ৭৬

তোমাদের গল্প
যমুনার তীরে : মেহেদী হাসান সানি ৮১

তোমাদের কবিতা
জাকারিয়া আল হোসাইন ৬৪
জুবায়ের বিন ইয়াছিন, মাহমুদুল হাসান ৭১
আমানত মিয়া ৮০
আবুজার গিফারী ৮৪
শাহ্ নূর, সামিয়াতুত তানজীম ৯১
আব্দুল মুহিত মুর্শেদ, জনি সিদ্দিক ৯৪

পাঠক ফোরাম সংবাদ ৮৯

কুরআনের আলো ২, হাদিসের আলো ৩, আমাদের কথা ৫, ঝাঁপি থেকে ৬, অনুশীলন ৭ হাসির বাকসো ১৯, শব্দধাঁধা ৫০, রংতুলি ৮৫, বলতে পারো ৮৬

প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছ।

দেখতে দেখতে চলে গেল একটি বছর। বিদায় ১৪২৬! স্বাগত ১৪২৭!
বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখ থেকেই শুরু হয় বাংলা সনের গণনা। তোমাদের জন্য রইলো নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা।
বৈশাখ এলেই প্রাণস্পন্দনে মুখর হয়ে ওঠে গোটা মফস্বল, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার প্রভৃতি। চলে কত রকমের আয়োজন!
নতুন বছরে দোকানে দোকানে চলে হালখাতার পালা। চলে বৈশাখী মেলা, কত্ত রকমের খেলাধুলার পালা-পার্বণ! সেসব আয়োজন দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, ভরে যায় মন-প্রাণ। শহরে সে ধরনের আয়োজন বা আনন্দ লক্ষ করা যায় না। কেবল সীমাবদ্ধ থাকে বটতলায় বৈশাখীর মেলার মধ্যে!
এদিক দিয়ে গ্রামের মানুষ প্রকৃত অর্থেই আনন্দের প্রাচুর্যে ভরপুর।
আমরা চাই বৈশাখের প্রকৃত আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক গ্রাম থেকে শহরে ও গোটা বাংলাদেশে। সেই সাথে চালু হোক সর্বস্তরে বাংলা সন ও তারিখের ব্যবহার। তাহলেই সার্থক হয়ে উঠবে বৈশাখ-কেন্দ্রিক আমাদের সকল আয়োজন ও আনন্দ।
ঋতু হিসাবে এটা গ্রীষ্মকাল। বছরের প্রথম ঋতু। বৈশাখ আসে উদ্দাম উল্লাসে। ঝড়ো হাওয়ার সাথে।
বৈশাখ তারুণ্যের প্রতীক।
যৌবনের প্রতীক।
তারুণ্যই একমাত্র পারে পুরাতনকে ভেঙে নতুন করে গড়তে। আমরা চাই সেই তারুণ্য, সেই যৌবনদীপ্ত প্রাণ। আমরা চাই বৈশাখের মত শত-সহস্র উচ্ছল প্রাণ। আমরা যেন আমাদের এই চির সবুজের দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।
আবারও জানাচ্ছি তোমাদের প্রতি বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা।
আজ এই পর্যন্তই! আল্লাহ হাফিজ। ■

কিশোরকণ্ঠে সাধারণ জ্ঞানের একটি বিভাগ চালু করার জন্য অনুরোধ করছি। তাতে কিশোররা সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। ধন্যবাদ।

– খুব সুন্দর পরামর্শ। ধন্যবাদ

আহমেদ মারুফ

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা

কিশোরকণ্ঠের আগামী সংখ্যায় পবিত্র রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করলে ভালো হয়।

– দেখা যাক।

সালমান মাহদী

সারপটি, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা

এ বছর ২০২০ "জাতীয় পাঠ প্রতিযোগিতা" হবে কি? কোন মাসে হবে বলবেন?

– পরে জানানো হবে, ইনশাআল্লাহ।

দুর্জয় দত্ত প্রহর

সদর, মৌলভীবাজার

কিশোরকণ্ঠে প্রতি মাসে ছোট্ট একটি সূরা বা একটি আয়াত এবং একটি হাদিস অনুবাদসহ রাখা হোক ইনশাআল্লাহ।

– প্রতি সংখ্যায় হাদিস-কুরআনের বিষয় তো থাকেই ভাইয়া।

আল মাহমুদ

জিয়ানগর, পিরোজপুর

অনুশীলন

প্রিয় বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছো। এবারও একটি কবিতার প্রথম অংশটি দেয়া হলো। এর বাকি অংশটুকু লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দাও। প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা আরও বেশি বেশি করে অনুশীলনে অংশগ্রহণ করবে। আল্লাহ হাফিজ।
তোমাদেরই পরিচালক ভাইয়া।

ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসের ছড়া

"বোশেখ এলে থর থরিয়ে
কেউবা কাঁপে ভয়ের চোটে
কেউবা হাসে খিলখিলিয়ে
বুকে যাদের সাহস ছোটে।"

বোশেখ এলে মিষ্টি রোদে
ভরে সবার মন,
বোশেখ এলে আম কুড়াতে
কাটে সারাক্ষণ।

বোশেখ এলে টগবগিয়ে
কাঁপে সকল মাঠ,
চাষি বলে কাজটা রেখে
জিরিয়ে নেয়া যাক।

মোহাম্মদ হাছান
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর

এপ্রিল ২০২০ মাসের ছড়া

"আকাশ ভরা মেঘের মেলা
ঝমাঝম বৃষ্টি
বৃষ্টির ফোঁটা এমনি মোটা
যায় না দূরে দৃষ্টি।"

আরো যাদের লেখা ভালো হয়েছে

মো: ইয়াছিন আরাফাত, ডিমলা, নীলফামারী; হাবিব রাশেদ, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী; মেহেদি হাসান হৃদয়, নোয়াখালী; মিরাজ হোসেন, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর; মাহাবুব আলম, ছোট কাঁচনা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর; আশফাকুর রহমান নাইম, দৌলত মুন্সি বাইলেন, কৃষ্টপুর, সদর, ময়মনসিংহ; হাবিব রাশেদ, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী; মু. জাহিদ হাসান, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

বোল এসেছে

আশরাফ আল দীন

কবিতা

আমের গাছে বোল এসেছে ডালপালা সব বাঁকিয়ে,
ক'দিন পরেই বোশেখ এসে দেবে তাকে ঝাঁকিয়ে।

এরপরে যা থাকবে সেটাই মধু-মাসের আম রে!
রসনাটা তৃপ্ত হবে আমগুলোকে কামড়ে।

ঠিক সময়ে যত্ন নিলে অনেকগুলো বোল,
ঝরতো না হায় অবহেলায় হতো না বাতুল!

যত্ন নিলে ঝরে-পড়াদের অনেকেই তো বাঁচে!
দেখো দেখো শিশুর দিকে, ওতেই আশা আছে।

আমাদের এই দেশ

আবুল হোসেন আজাদ

আমাদের এই দেশ নদী ফুল ফল
সবুজের সমারোহ বায়ু সুশীতল ।
পাকুড়ের ছায়াতলে রাখালের বাঁশি
তারাদের মিটিমিটি জোছনার হাসি ।
মন ভরে যায় শুনে পাখিদের গান
মাঠজুড়ে ফলে গম তিল পাট ধান ।
নাও ছেড়ে ভাটিয়ালি মাঝি গেয়ে যায়
গলুইতে হাল ধরে দূরে ভিনগাঁয় ।
কৃষকের মুখে সুখে হাসি অনাবিল
অতিথি পাখির মেলা জুড়ে বিলঝিল ।
প্রজাপতি মৌমাছি ফড়িংরা উড়ে
এসে বসে ফুল সনে মধু নিতে ঢুঁড়ে ।
আম জাম কাঁঠালের সারিসারি গাছ
খাল নদী পুকুরের জলে ভরা মাছ ।
এই দেশ আমাদের রূপ রাশি রাশি
আজীবন প্রাণ দিয়ে একে ভালোবাসি ।

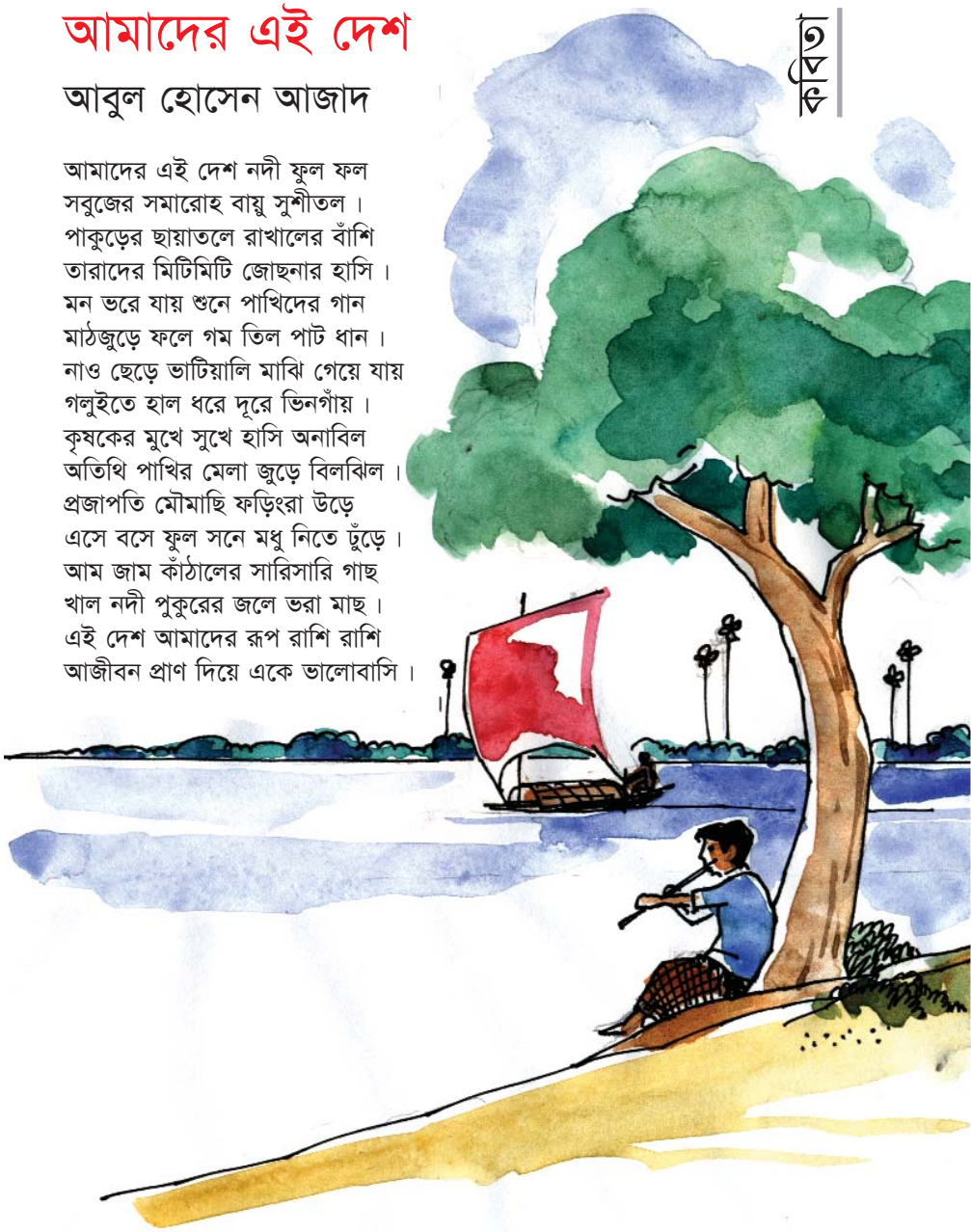

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

হজ্ব ও ওমরাহ্

বুকিং চলছে

www.kabarpothe.com

স্বত্বাধিকারী

খাদেমুল হুজ্জাজ (মুয়াল্লিম)

আলহাজ্ব মাও: আবু শাকের মু. ইউনুছ

এম এম, এম. এ (ফার্স্ট ক্লাস)

মোবা: 01779 131243
01678 041243

হজ্ব এন্ট্রিতে যা লাগবে

এন. আই. ডি
মোবাইল নং
এন্ট্রি ফি

(১৪ দিনের)

ওমরাহ্

মক্কায় ৭ দিন
মদিনায় ৬ দিন

ওমরাহ্ প্যাকেজ মূল্য

ট্রানজিট ৮৫,০০০/-
সরাসরি ৯৫,০০০/-
৩ স্টার ১,২০,০০০/-
৫ স্টার ১,৫০,০০০/-

ATAB

Biman BANGLADESH AIRLINES

নির্ভূলভাবে হজ ও ওমরাহ পালনে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান

কাবার পথে এভিয়েশন

অফিসঃ রহমানিয়া ইন্টাঃ কমপ্লেক্স, ৯ম তলা (রুম নং-১১)
২৮/১/সি টয়েনবী সার্কুলার রোড, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

01707 165527
01920 343506

নব বৈশাখে

মাহমুদুল হাসান নিজামী

দুরন্ত বৈশাখে এক উড়ন্ত হাওয়া এসে
দোলা দেয় মন
অশ্রুমাখা ক্ষিপ্ত মেঘ পুবাল ঝড়
সে এখন আছে কেমন?

ঘূর্ণি হাওয়ায় কাঁদে রাত
আকাশে মেঘের ভেলা
কেউ নেই পাশে আজ
ঝিলিক ঝিলিক বিজলির খেলা।

ঈশান কোণে ঝড় নেমেছে
আমার আকাশে মেঘ
বৈশাখী ঝড় মুছে ফেলে স্মৃতি
বুকে তাই উদ্বেগ।

এই বৈশাখ মুছে দিয়েছিল
স্মৃতির কত দাগ
নব বৈশাখে ফিরে আসুক
আমার সব অনুরাগ।

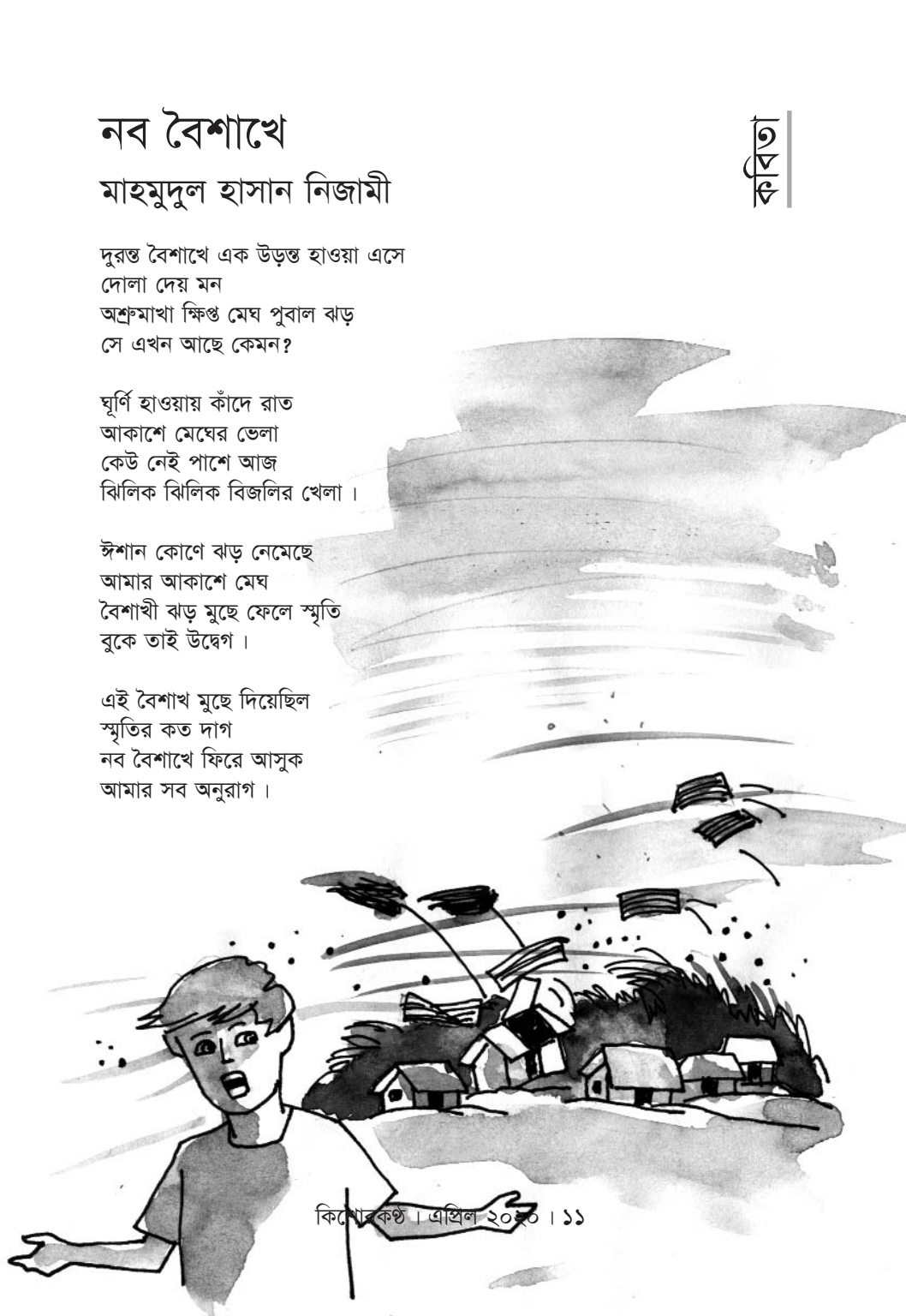

গ্রামবাংলার ছনের ঘর

আবদাল মাহবুব কোরেশী

প্রচ্ছদ রচনা

বাঁশ, বেত, ছন, বিন্নাখড়, ইকড়, মই, লাঙ্গল, জোয়াল, পাইজং (কঞ্চি) উগার (যেখানে ধান রাখা হতো) উনদাল (রান্নাঘর) টঙ্গী, বাংলাঘর বা বৈঠকখানা ইত্যাদি গ্রামবাংলার জনজীবনে নিত্যদিন উচ্চারিত বাক্য বা শব্দ। ইদানীং আর সেই সব শব্দ কারো মুখে উচ্চারিত হয় না বললেই চলে। দেখা যায় না, এক সময়ের গ্রামীণ জনপদের অতি পরিচিত সামগ্রী মাটির হাঁড়ি, বাটি, মাটির কলসি,

বাসনসহ অনেক কিছু। মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধা, কলসিতে পানি আনা আর মাটির প্লেটে (এ প্লেটকে তখন বলা হতো হানোক) ভাত খাওয়া ছিলো সাধারণ রীতি। নকশা করা এসব মাটির বাসন ছিলো নানা ঢঙের ও নানা রঙের। মাটি দিয়ে তৈরি এসব সামগ্রী রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে এক ধরনের দক্ষ কারিগর তা তৈরি করতেন। ফেরিওয়ালারা ফেরি করে গ্রামের ঝি-বউদের কাছে এসব বাসন বিক্রি করতো। ঝি-বউরা দেখে শুনে নিজের প্রয়োজন অনুসারে তা রাখতেন। হাদিয়া বা মূল্য হিসাবে ধান অথবা চাল দিয়েই বেশির ভাগ সময় তারা ফেরিওয়ালাদের খুশি করতেন, আবার কখনো কখনো কাঁচা পয়সা বা টাকা দিয়ে মূল্য শোধ করতেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এসব বাস্তবতা আজ শুধু কল্পনা। মাটির বাসনে আজ-কাল ঝি-বউরা ভাত রাঁধেনও না এবং তাদের স্বামী সন্তানদেরও এসব প্লেট বা হানোকে আর ভাত খেতেও দেখা যায় না। অতীতের সেই পরিবেশনা আজ গল্পের কালো অক্ষরে দীপ্তমান, যা পড়লে প্রবীণরা খুঁজে পায় তাঁর ছোট্টবেলার চঞ্চল দিনগুলোর রোমাঞ্চকর ঘটনাপ্রবাহ আর নতুন প্রজন্ম খুঁজে পায় ডালিম কুমারের গল্প, গোপাল ভাঁড় কিংবা মোল্লা নাসিরউদ্দিনের হাসির বাক্স। গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া এসব জিনিসকে উপলক্ষ করে আজকের লেখাটি আমার ছোট্ট বন্ধুদের সৌজন্যে সবার কাছে উপহার দিতে চাই আর আমার বিজ্ঞ বন্ধুদের নিয়ে যেতে চাই উনিশ শতক থেকে আরো আগের গ্রামবাংলার পথ-প্রান্তরে কিংবা মাটি দিয়ে তৈরি আর ছন দিয়ে

মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধা, কলসিতে পানি আনা আর মাটির প্লেটে (এ প্লেটকে তখন বলা হতো হানোক) ভাত খাওয়া ছিলো সাধারণ রীতি। নকশা করা এসব মাটির বাসন ছিলো নানা ঢঙের ও নানা রঙের। মাটি দিয়ে তৈরি এসব সামগ্রী রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে এক ধরনের দক্ষ কারিগর তা তৈরি করতেন

চালা দেয়া ঘরের উঠোনে। যেথায় দেখা যাবে সামনে বিরাট পুকুর। তাল বা খেজুর গাছের এলোপাতাড়ি সিঁড়ি দেয়া পুকুরঘাট। ঘাটের এক কোণ দিয়ে গ্রাম্য বালক-বালিকাদের লাফালাফি। পুকুরে নন্দাই (পুকুরে এক ধরনের ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা) খেলার জমজমাট আসর কাবাডি, ছোঁয়াছুঁয়ি, কিংবা বিশেষ ধরনের মাছ শিকার করার পদ্ধতি, যার মাধ্যমে

দারকানা, পুঁটি কিংবা ইঁচা জাতীয় মাছ শিকার অথবা বাড়ির এক কোনায় গোয়ালঘরে কয়েকটা গাভীর হাম্বাহাম্বা আকাশ ভাঙা চিৎকার। গোয়ালঘরের ঠিক বাম পাশে ইয়া মোটা খড়ের ফেইন (ধানের খড় দিয়ে তৈরি করা এক প্রকার গো-খাদ্য)। আর রশিক নাথের বেরশিক হাঁক- মাইজি গো, ও মাই..জি। রাখবেন নি... চিঁড়ার খই, ভেটের খই, আর মুড়ির খই ইত্যাদি.. ইত্যাদি। এ সবই আজ কল্পনার সাগরে ভাসমান। বাস্তবে এসবের দেখা আর মিলবে না। তবে আবহমান বাংলার এসব স্মৃতি বহন করে আগামী ভবিষ্যৎ সন্তানরা স্বর্ণালি একদিন আমাদের উপহার দিবে তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। তাই বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিতে হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ছনের ঘর নিয়ে কিছু গল্প না করলেই নয়। গল্প শুরু করার আগে ছন কী? কোথায় তার জন্ম? তার ব্যবহার পদ্ধতি-ই বা কী? এসব জানা তো আমাদের খুব দরকার। তাই চলো বন্ধুরা, এসো প্রথমেই জেনে নেই ছন আসলে কী?

ছন হলো গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা এক প্রকার ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। ছনের পাতা বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। কোনটা আড়াআড়ি লম্বা আবার কোনটা খাটো। বাংলাদেশে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বনজ উদ্ভিদ। এবং কোনো কোনো স্থানে ছন একটি অর্থকরী ফসলও বটে। সাধারণত এটি অনাবৃত পাহাড়ে জন্মে। তাই ছনকে পাহাড়ি অঞ্চলে-ই বেশি দেখা যায়। তবে অনেক স্থানে কখনো গুচ্ছভাবে পুকুর বা দিঘীর পাড়ে ছন দেখতে পাওয়া যায়। ছন তার বীজ ও মূল দিয়ে দ্রুত ছড়ায়। বাতাসের মাধ্যমে নতুন নতুন পরিবেশে ছনের বীজ ছড়িয়ে পড়ে এবং তার বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। সুতরাং ছন একবার ফলন পেলে এ ঘাস মূলের মাধ্যমে দ্রুত বংশ বিস্তার করে থাকে। বছরের আশ্বিন থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত ছন আহরণ করা হয়। চাষাবাদে তেমন পরিশ্রম নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র পাহাড়ের যে অংশে ছন চাষ করা হবে তা পরিষ্কার করে দিলেই হয়। কিছুদিন পর প্রাকৃতিকভাবেই ছনের কুঁড়ি জন্ম নেয় এবং প্রাকৃতিকভাবেই তা প্রসার ঘটে। অতঃপর ছন প্রায় দেড় থেকে দুই হাত লম্বা হলে তার সকল আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। সম্ভব হলে একবার ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ফলন ভালো হয়। অন্যদিকে বাগানে বড় কোন গাছ থাকলে তার ছায়া ও পাতা পড়ে ছনের বৃদ্ধিতে যেমনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তেমনি ছনে পচন ধরে নষ্ট হয়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। সুতরাং সে দিক থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছন প্রায় ৬ থেকে ৭ ফুট লম্বা হলে তার পূর্ণতা পায় এবং কাটার উপযুক্ত হয়। এ সময় ছন কেটে ১৫ থেকে ২৫ দিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। সবুজ রং থেকে ঝনঝনে বাদামি রং ধারণ করলে ছন ব্যবহারে উপযোগী হয়েছে বলে ধরে নিতে হয়।

গ্রামবাংলার ছনের ঘর

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে তার পরিচয় সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে। সুতরাং সমাজে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য তার বিশেষ বিশেষ কিছু

উপাদানের প্রয়োজন হয়। সে কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদার হিসাব মতে বাসস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সে উপাদানকে পায়ে ঠেলে একজন মানুষ জীবনের কঠিন যুদ্ধে জয়ী হয়েছে বা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার নজির খুব একটা পাওয়া যায় না। কাঁচা হোক, আর পাকা হোক, নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকলে, তার মতো অসহায় আর কেউ হতে পারে বলে আমাদের জানা নেই। আল্লাহর সৃষ্টির সকল প্রাণী সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে একটা সময় সে তার আপন ঠিকানায় ঘরমুখো হবে, তা কোন গল্পকথা নয়, বাস্তবতা। সে বাস্তবতার রেশ ধরেই একটু সুখের জন্য মানুষ তার স্বাধ্যমত মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে প্রথমেই একটি ঘরের ব্যবস্থা করে থাকে। সে ঘরটা কেমন হবে, তা নির্ভর করে তার আয়-সঙ্গতির ওপর। সে হিসেবে তৎসময়ের গ্রামীণ সমাজের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষই ছিলো গতরখাটা বা খেটে খাওয়া মানুষ। 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়'– এ রকম সমাজে ইটের গাঁথুনি দিয়ে ঘর বাঁধা ছিলো তাদের কল্পনা বিলাস। সাধ আছে সাধ্য নাই এ রকম অবস্থায় বাঁশের তরজা অথবা ইকর দিয়ে বেড়া দেয়া ছনের ঘরকেই তাদের প্রথম বিলাস হিসেবেই পছন্দ করতো। তাই দেখা যেত ইকর বা বাঁশের তরজা দিয়ে তৈরি গ্রামের বেশির ভাগ দু-চালা ছনের ঘর। আবার কখনো কখনো মাটি দিয়ে তৈরি ছন দিয়ে ছাওয়া ঘরও দেখা যেত। মাটিকে বিশেষ কায়দায় কাদা করে একটি ঘরের দেয়াল তৈরি করা হতো। এ ক্ষেত্রে মাটির দেয়াল দিয়ে একটি ঘর তৈরি করতে

মাসখানেক সময় লাগতো। তবে তা ছিলো একেবারেই যৎসামান্য। কারণ তুলনামূলকভাবে খরচের পাল্লা একটু বেশি হতো বিধায় বেশির ভাগ মানুষের তা তৈরি করা সাধ্যের মধ্যে ছিলো না। তা ছাড়া বৃষ্টির জমাটবদ্ধ পানি মাটির ঘরের জন্য ছিলো বিরাট হুমকি। বর্ষা ও বন্যার সময় জমাটবদ্ধ পানিতে অনেক মাটির ঘর ভেঙে পড়েছে, তার যথেষ্ট গল্প এখনো শুনা যায় মা-বাবা ও দাদা-দাদীর কাছ থেকে। সে কারণে মাটির ঘর তৈরির আগ্রহ মানুষের তেমন ছিলো না। যা তৈরি হতো তা নেহাত শখের বশে এবং তা ছিলো একেবারে হাতেগোনা।

ছনের ঘর যেভাবে তৈরি হতো

ছনের ঘর তৈরির প্রধান রসদই ছিলো গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা বনজ এই ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, যার নাম ছন। পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা এই ছন-ই ছিলো তৎকালীন সময়ে গ্রামবাংলার মানুষের ঘরের ছানি বা চাল। ঘরের অবকাঠামো অর্থাৎ বেড়া তৈরি হতো এক প্রকার বনজ উদ্ভিদ 'ইকর' অথবা এক প্রকার বাঁশকে খণ্ড খণ্ড করে জালিফলা করে তরজার মাধ্যমে। চাল তৈরি করতে ছোট ছোট মুলিবাঁশ ব্যবহার করা হতো। প্রথমেই মুলিবাঁশকে বিশেষ কায়দায় পিঞ্জিরার মতো করে বাঁশের বেত অথবা জালিবেত দিয়ে শক্ত করে একে অপরটির সাথে বেঁধে দেয়া হতো। এই পিঞ্জিরার মতো বেঁধে দেওয়া চালের ওপর বিশেষ কায়দায় ছনকে সাজিয়ে দেয়া হতো। কয়েকটি ধাপে ছনগুলোকে বিন্যাস করে তার ওপরে বাঁশ দিয়ে বেতের মাধ্যমে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হতো। তখন স্থানীয় ভাষায় তাকে ছাউনি বলা হতো। পরবর্তীতে এই ছাউনিকে লাঠিপেটা করা হতো এবং তার ওপর বেশি করে পানি ঢালা হতো যাতে ছনগুলো এলোমেলো না থেকে সোজা হয়ে বাঁশের ওপর ভালো

করে বসে যায় ও ছাউনির কোন ফাঁকফোকর দিয়ে ঘরের ভিতরে পানি প্রবেশ করে কি না তাও দেখা যায়। এভাবেই ছন দিয়ে অন্তত প্রতি দু-এক বছর পর চাল ছাওয়া হতো। মুরব্বিদের কাছ থেকে জানা যায়, সে সময়কালে গ্রামবাংলার গৃহনির্মাণ রীতি ছিল খুবই সরল। সাধারণত সামনে ও পিছনে বারান্দা রেখে দুই কক্ষবিশিষ্ট দু'চালা ঘরই বেশি দেখা যেত। আলাদা করে রান্নাঘর রাখলেও মূল ঘরের সাথে এর সংযোগ থাকতো। আবার কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও হতো। তুলনামূলকভাবে সচ্ছল লোকেরা দিনমজুরকে দিয়েই ছাউনি বাঁধার কাজ সারতেন। তবে সাধারণ মানুষের বেলায় তা ছিলো সম্পূর্ণ এক আলাদা রেওয়াজ। যেমন কারো বাড়িতে চালা তৈরি করার সময় হলে তিনি সারা গ্রামের মানুষকে দাওয়াত দিতেন। লোকেরা তার দাওয়াত সানন্দে গ্রহণ করতো। এবং চালা তৈরির কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য গ্রামের যুবক প্রৌঢ় এমনকি বৃদ্ধরাও তার বাড়িতে ভিড় করতেন। এটা ওটা কাজের ফাঁকে কোরাসকণ্ঠের গান তার সাথে হাসি-তামাশা, হৈ-হুল্লোড়সহ এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হতো। হেসে খেলে লোকেরা নিজ দায়িত্বে যৌথশ্রমে নিমিষেই শেষ করে নিতেন ঘরের ছাউনি দেওয়ার কাজ। তারপর শুরু হতো ভোজনবিলাসের আনন্দপর্ব। গৃহকর্তা সাধ্য অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা রাখতেন। এ ক্ষেত্রে ডাল সবজি সাথে গৃহকর্ত্রীর সবচেয়ে মোটা ও বড় লাল মোরগটা জবাই করে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হতো, সাথে পান-সুপারি আর তামাক-তো ছিলো-ই, যা বড়দের সুখের টান আর ঠোঁট লাল করতে পান-সুপারি চিবোতে কখনো ভুল-ই হতো না। শ্রমের মূল্য হিসেবে এই ছিলো তাদের সর্বোচ্চ চাওয়া এবং পাওয়া। এখানে টাকা-পয়সার কোনো ব্যাপার ছিলো না। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আর একে অপরের প্রতি ভালোবাসার টানটাই ছিলো

সবচেয়ে বড়। সামাজিক সম্প্রীতি আর একে অন্যকে ভালোবাসা এবং সাহায্য করার এই রীতি ছিল তৎকালীন সময়ে গ্রামবাংলার মানুষের চির-অহঙ্কার। শত ব্যস্ততা আর হাজার কষ্টের মাঝেও শত বছর থেকে চলে আসা তাদের এই চমৎকার ঐতিহ্য কোন লোকদেখানোর ব্যাপার ছিলো না। ছিলো, ভাই ভাইকে সাহায্য করার অনন্য এক বিবেকবোধের প্রকাশ। সবচেয়ে ভালো দিকটা ছিলো তাদের এই বিবেকবোধ শুধু কোন এক গোষ্ঠীভিত্তিক ছিলো না, ছিলো ধর্ম-বর্ণ সবার প্রতি সমান, যা বর্তমান সময়ের সাথে তুলনা করলে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র সমাজ শুধু লজ্জাই পাবে না, নিজেকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বাধ্য হবে। অবশ্য সে বোধোদয় আর তা অনুভব করার যোগ্যতা যদি থাকে! কারণ আত্মকেন্দ্রিক বর্তমান সমাজব্যবস্থা আজ আমাদের সরল বিবেকবোধকে একেবারে অন্ধ করে দিয়েছে। আমরা আজ নিজেকে নিয়ে নিজেদের সাথেই প্রতারণা করছি। সুতরাং এই ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের স্বার্থে। আগামী প্রজন্মের স্বার্থে।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রামের সেই সহজ-সরল মানুষের সরল সমীকরণ আজ যেমন চোখে পড়ে না, ঠিক তেমনি চোখে পড়ে না আমাদের হাজারো বছরের গ্রামীণ ঐতিহ্যে। বিজ্ঞানের এই নব নব আবিষ্কার কেড়ে নিতে বসেছে আমাদের গ্রামীণ সমাজের শেষ চিহ্নটি। ইট-বালু আর সিমেন্টের গ্যাঁড়াকলে পড়ে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের মূল্যবান অনেক কিছু, যা পুষিয়ে নেয়া আর কখনো যাবে কি না সন্দেহ। তবে এ কথা ঠিক যে, সেদিনটি আর খুব বেশি দূরে নয়; যেদিন ছনের ছাউনি ও তরজা দেয়া ঘরের কথা মানুষের মন থেকে চিরতরে উঠে যাবে। গ্রামের সরল মানুষের সরলতাও হাসির খোরাক হবে।

শিক্ষক এবং লাড্ডুর (ছাত্র) মধ্যে কথোপকথন–

শিক্ষক : এই লাড্ডু বল তো, একটি গাভী একদিনে ১ লিটার দুধ দিলে; ১ সপ্তাহে কত লিটার দিবে?

লাড্ডু : খুবই ইজি! সাড়ে ৫ লিটার!

শিক্ষক : হ্যাঁ! কেমনে...?

লাড্ডু : শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ ৫ দিনে ৫ লিটার, বৃহস্পতিবার হাফ ক্লাস আর শুক্রবার তো ছুটির দিন...!!

এম.বি.বি.কে
পিরব, শিবগঞ্জ, বগুড়া

বাবা ও ছেলের মাঝে কথোপকথন–

বাবা- তোর ফোনে টাকা আছে?

ছেলে- হ্যাঁ, বাবা ।

বাবা- তাহলে তোর মেজো ভাইয়ের কাছে একটা ফোন দেতো

ছেলে - ফোন তো যাবে না!

বাবা - (রেগে বললেন) কেন?

ছেলে - টাকা যে বিকাশে!

সাখাওয়াত হোসেন
পরশুরাম, ফেনী

শহরে থাকা বন্ধুর কাছে গ্রাম থেকে প্রথম বেড়াতে আসা দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন...

অনিক : কতটুকু এসেছিস বাবলু?

বাবলু : আমি বলতে পারি না, এটা কোন জায়গা...!

অনিক : গাড়ির জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে দেখ এটা কোন জায়গা...

বাবলু : (বাস কাউন্টারের সাইনবোর্ড দেখে) এটাতো চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, নোয়াখালী...

অনিক : বলিস কী! তুই কোন গাড়িতে উঠলি?

বাবলু: হিমাচল, শ্যামলী, জোনাকি, স্টার লাইন, লাল সবুজ....

অনিক: তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে বাঁধন গাড়িতে উঠ...

বাবলু: গাড়ি থেকে নেমে দেখলো সে যে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটছে সেটাই বাঁধন গাড়ি ছিল!

আবদুল করিম সুমন
নোয়াখালী

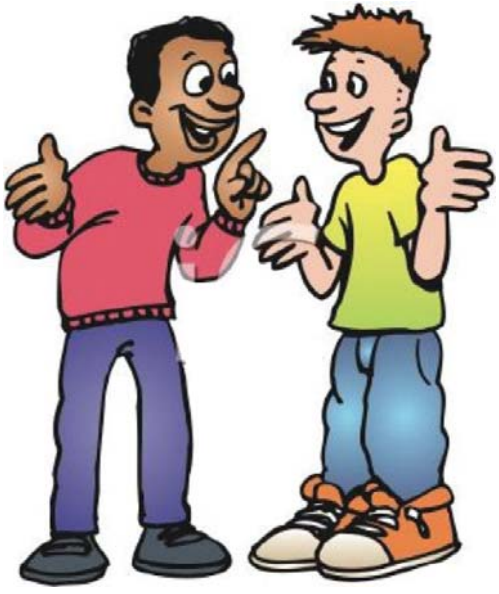

বিশেষ রচনা

পহেলা বৈশাখ

মামুন মাহফুজ

পহেলা বৈশাখ শুধু বাংলাদেশের নয় বাঙালির ঐতিহ্য। এই উৎসবটি শত শত বছর ধরে বাঙালি উদযাপন করে আসছে নিজেদের মতো করেই। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো পহেলা বৈশাখ এমন এক উৎসব যা হিন্দু মুসলিম সব ধর্মের মানুষই তাদের মতো করে পালন করে থাকে।

পহেলা বৈশাখের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, এটি আগে আর্তব উৎসব নামে পালিত হতো। যার অর্থ হচ্ছে ঋতুর উৎসব বা ঋতুকেন্দ্রিক উৎসব। এরপর সম্রাট আকবরের আমলে এটি পহেলা বৈশাখ হিসেবে

মেলায় নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে মানুষ অংশ নেয়। খেলনা কেনে, চরকিতে ঘোরে। দিনটি শিশুদের জন্য বিশেষ আনন্দের।

পালিত হয়ে আসছে। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই সন গণনা কার্যকর করা হয় ৫ নভেম্বর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। কারণ ওই দিনটি ছিল সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের দিন।

বর্তমানে পহেলা বৈশাখকে ঘিরে নানান ধরনের আয়োজন লক্ষণীয়। তবে প্রাচীনকালে পহেলা বৈশাখ বিশেষভাবেই ছিল ফসলের উৎসব হিসেবে। এমনকি এই পহেলা বৈশাখ কিন্তু কেবল আনন্দ বা উৎসবের জন্য প্রবর্তিত হয়নি। বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, কর্মজীবী মানুষের অনেক গল্প।

গল্পটা আমাদের সবারই জানা উচিত। আমরাতো সবাই জানি যে এই ভারতীয় উপমহাদেশে যে মুঘল শাসকরা ছিলেন তারা কিন্তু খাজনা আদায়ের মাধ্যমেই সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু মুঘল আমলে এই খাজনা আদায়ের কাজটি ছিল হিজরি মাস অনুযায়ী। কিন্তু হিজরি মাস চন্দ্রবর্ষ বা চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় খাজনা আদায়ে অনেক জটিলতা তৈরি হতো। চন্দ্রবর্ষ ৩৫৪ দিনের, আর খ্রিষ্টবর্ষ হলো ৩৬৫ দিনের। অর্থাৎ চন্দ্রবর্ষ ১১ দিন কম। ফলে এ বছর যে তারিখে খাজনা আদায় করা হতো পরের বছরে তা এগারো দিন এগিয়ে আসতো। এভাবে তিন বছর পর একমাস এগিয়ে যেত। অথচ কৃষিজীবী মানুষের ফসলের মৌসুম কিন্তু এগিয়ে আসে না। ফলে তাদের খাজনা দিতে সমস্যা হতো। এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। আর বাংলা সনের প্রথম মাস হলো বৈশাখ এবং পহেলা বৈশাখ হলো বাংলা সনের প্রথম দিন। অর্থাৎ গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি বা খ্রিস্টবর্ষের প্রথম দিন যেমন জানুয়ারির প্রথম দিন, তেমনি বাংলা সনের প্রথম দিন হচ্ছে পহেলা বৈশাখ।

বাংলা সন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমরাতো জানিই মুঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকে এটি শুরু হয়। কিন্তু সম্রাট আকবর মূলত কৃষিকাজ ও রাজস্ব আদায়ে সামঞ্জস্য আনার জন্য প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সম্রাটের আদেশে রাজ-জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহ উল্লাহ সিরাজি সৌরবর্ষ এবং হিজরিবর্ষ দুটোকে ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।

অনেকেই মনে করে থাকে যে বাংলা সন বোধ হয় হিন্দুধর্মের আবিষ্কার বা হিন্দুদের আবিষ্কার, এমনকি কোনও কোনও ঐতিহাসিক দাবিও করেন এটি

সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন

শহরের মানুষ অন্যদিন ভোরে না উঠলেও এই দিন খুব ভোরে ওঠে পান্তা ভাত খায়, কেউ আলু ভর্তা, শুকনা মরিচ দিয়ে, কেউবা ইলিশ মাছ দিয়ে

সপ্তম শতকের রাজা শশাঙ্কের প্রবর্তিত। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে ১৪ এপ্রিল থেকে যে পহেলা বৈশাখ বা বাংলা সন গণনা হয়ে আসছে তা সম্রাট আকবরের আমলে শুরু এবং তার রাজ-জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহ উল্লাহ সিরাজির গবেষণার ফল এবং পহেলা বৈশাখ পালন কোনও হিন্দুয়ানি সংস্কৃতিও নয়। এটি সব ধর্মের মানুষই তাদের মতো করে পালন করে আসছে। বিশেষ করে কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত মানুষেরা এই বঙ্গাব্দকেই তাদের ফসল কাটার, বা খাজনা দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিল।

চৈত্রসংক্রান্তি বা চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে ফসলের খাজনা আদায় করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া ছিল। তারপর পহেলা বৈশাখ খাজনা আদায়ের পর রাজা বা জমিদাররা প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। সেই থেকে পহেলা বৈশাখ একটি উৎসব হয়ে ওঠে বাঙালির জন্য। কারণ একদিকে খাজনা আদায় শেষ অন্যদিকে নতুন ফসলের নতুন ঘ্রাণ। সবার মুখেই ফুটতো সুখের এবং স্বস্তির হাসি। পহেলা বৈশাখ শুধু বাংলাদেশের মানুষের উৎসব নয় বরং এটি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মনিপুর, নেপাল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং ত্রিপুরার বাঙালিদের উৎসব।

প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি বাঙালির এই ঐতিহ্যবাহী পহেলা বৈশাখেরও অনেক ব্যাপ্তি এবং বিকৃতি ঘটেছে। বাংলাদেশের মানুষ এই উৎসবকে আজ প্রাচীন ঐতিহ্যের বেলাভূমি থেকে সরিয়ে নতুন কিছু সংস্কৃতির যোগ ঘটিয়েছে। এখন গ্রামের মানুষ আর শহুরে মানুষ অনেকটাই আলাদাভাবে, আলাদা আলাদা

আয়োজনে পালন করে দিনটি। গ্রামের মানুষ প্রতিদিনের মত খুব ভোরে উঠে নতুন জামাকাপড় পরে পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যায়, নিজের ঘরদোর পরিষ্কার করে, বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করে, আবার কয়েক গ্রামের মানুষ একত্র হয়ে আয়োজন করে গ্রামীণ মেলার।

এর নাম বৈশাখী মেলা। মেলায় নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে মানুষ অংশ নেয়। খেলনা কেনে, চরকিতে ঘোরে। দিনটি শিশুদের জন্য বিশেষ আনন্দের।

এছাড়া পহেলা বৈশাখকে ঘিরে আয়োজন করা হয় নৌকাবাইচ খেলা, লাঠিখেলা, কুস্তিখেলা, জব্বারের বলিখেলাসহ নানান ধরনের গ্রামীণ খেলার। অন্য দিকে শহরের মানুষ অন্যদিন ভোরে না উঠলেও এই দিন খুব ভোরে ওঠে পান্তা ভাত খায়, কেউ আলু ভর্তা, শুকনা মরিচ দিয়ে, কেউবা ইলিশ মাছ দিয়ে। আর এই সুযোগে কিছু ব্যবসায়ী ইলিশ মাছের দাম হাঁকায়। পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে দিনটি পালিত হয়। সেখানে গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের মানুষেরা একত্র হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে বলতে গেলে পুরো চৈত্রমাসজুড়েই নানান অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। এরপর হয় চৈত্রসংক্রান্তি। অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষ দিন গাজন উৎসব করে তারা। এই দিন চড়ক পূজা ও চড়ক মেলার আয়োজন করে থাকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তারা এটিকে ধর্মীয় উৎসবে রূপ দিয়ে থাকে। তবে প্রাচীন বাংলায় পহেলা বৈশাখ উৎসবের প্রধান আয়োজন ছিল হালখাতাকে কেন্দ্র করে। এখন সেটা অনেকটাই বিলুপ্তপ্রায়। এই হালখাতা করাটাকেও অনেকে মনে করে থাকে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি। অথচ জেনে অবাক হতে হয় যে হালখাতা দুটি আরবি শব্দের সমষ্টি। হাল এবং খাতা। হাল যে আরবি শব্দ তাতো সবাই কমবেশি জানে, সৌদি আরবে কেমন আছ? এটাকে বলা হয় কাইফা হালুকা, অর্থাৎ তোমার বর্তমান অবস্থা কী? আবার আমরা বলে থাকি হালনাগাদ করা। যেমন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। এর অর্থও ভোটার তালিকা নতুন করে করা বা ইংরেজিতে বলা যায় আপডেট করা। আর খাতা শব্দের অর্থ হিসাবের বই। লালমলাটের মোটা মোটা হিসাবের বই হয়তো এখনও দেখে থাকবে। এসব খাতা পহেলা বৈশাখের উৎসবে নতুন করে খোলা হতো। পুরনো বছরের সমস্ত পাওনাদি শোধ করে নতুন খাতা খুলতো হিসাবের। আর এই আয়োজনটি ছিল পহেলা বৈশাখ উৎসবের অন্যতম আনন্দের অনুষঙ্গ।

হালখাতা করা হতো ব্যবসায়ী বা দোকানিদের সাথে ক্রেতাসাধারণের সুন্দর একটা সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে। বছরজুড়েও যারা ব্যবসায়ীদের পাওনা শোধ করতে পারতো না তারা হালখাতার দিনে সমুদয় পাওনা পরিশোধ করে দিত। আর দোকানি বা ব্যবসায়ীরাও পাওনা টাকা পরিশোধকারীকে মিষ্টিমুখ করিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করতো। দোকানি হালখাতা উপলক্ষে খুব সুন্দর সুন্দর কার্ড করতো, চিঠি করতো, চিঠির ওপরে মুসলমানরা লিখতো এলাহি ভরসা বা আল্লাহ ভরসা আর হিন্দুরা লিখতো শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ। দোকানিরা দোকানের সামনে মাটি খুঁড়ে ইটের চুলা

লালমলাটের মোটা মোটা হিসাবের খাতা পহেলা বৈশাখের উৎসবে নতুন করে খোলা হতো। পুরনো বছরের সমস্ত পাওনাদি শোধ করে নতুন খাতা খুলতো হিসাবের

বসিয়ে দিনভর জিলাপি ভাজতো আর সবাইকে মিষ্টি মুখ করাতো। এই যে ঋণশোধের সংস্কৃতি এটাই কিন্তু ইসলামের শিক্ষা। কারণ ইসলাম ধর্মে আমরা জানি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করলেও আল্লাহ কোনও ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা গেলে তা ক্ষমা করেন না। ঋণ পরিশোধ ইসলামের ফরজ ইবাদত। আর সেই ফরজ আদায়ের পর তাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বুকে টেনে নেয়া, আপ্যায়ন করা এটাও ইসলামের সুমহান শিক্ষা। ঋণগ্রস্ত বক্তিকে সুযোগ দেওয়া, তার প্রতি দুর্ব্যবহার না করা, উল্টো তাকে মিষ্টিমুখ করানো অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি সামাজিক শিক্ষা। আর এই সংস্কৃতিই চর্চা হতো পহেলা বৈশাখকে ঘিরে।

যদিও আজ পহেলা বৈশাখ খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে শহুরে মানুষেরা অন্য মানুষকে বিরক্ত করে পালন করে থাকে। অথচ এই দিনটি ছিল মানুষকে আপন করে নেয়ার দিন, বন্ধুত্বের দিন, ঋণ পরিশোধের দিন।

আমরা আমাদের এমন গৌরবের দিনটি ভুলে এখন প্যাঁ পোঁ প্যাঁ পোঁ করে একে অপরকে বিরক্ত করে উৎসব পালন করে থাকি। এটি মোটেও কাম্য নয়। পহেলা বৈশাখ তার আপন মহিমায় ফিরে আসুক, ফিরে আসুক হালখাতার মতো সুন্দর সামাজিক ঋণপরিশোধের সংস্কৃতি, একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে দৃঢ় করার সংস্কৃতি। তাতে আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো যেমন সুদৃঢ় হবে, তেমনি বছরের এই দিনটিতে সকল পাওনা উদ্ধারের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরাও হবেন লাভবান, আর আমাদের দেশের অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে দারুণভাবে। এই কামনায় সকলকে জানাই শুভ বাংলা নববর্ষ!

গল্প

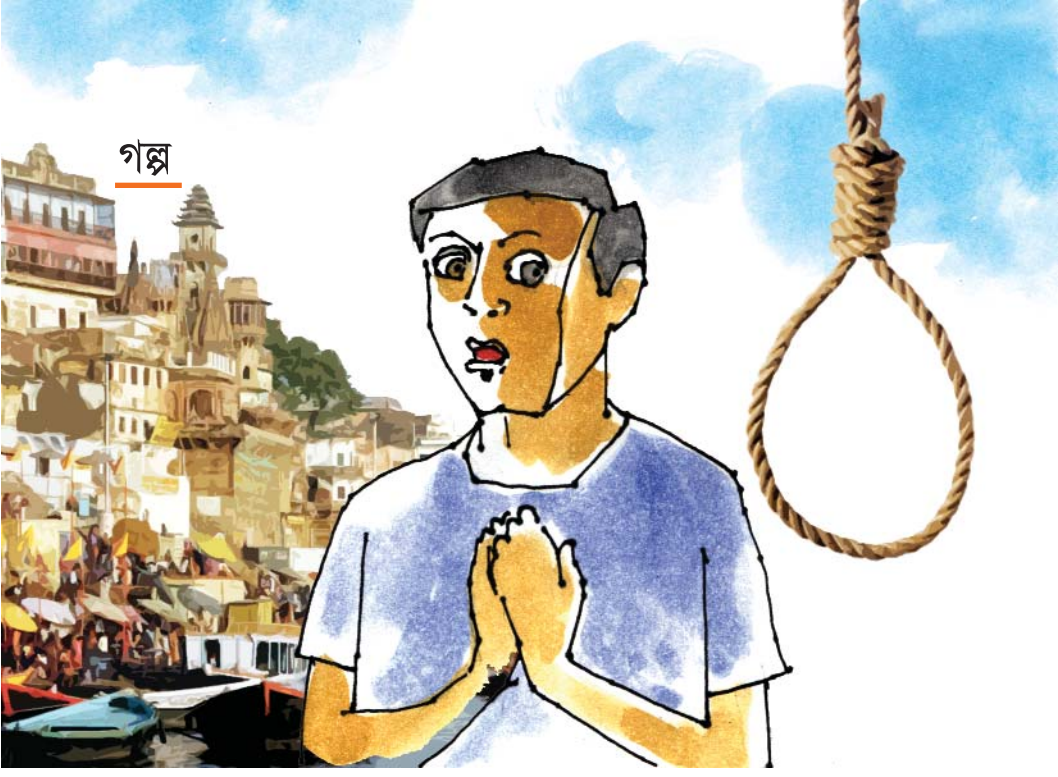

কাশীতে না ফাঁসিতে

এম শায়েস্তা খান

ব্যবসায়ী অতুল রায়ের স্ত্রী গত হয়েছে বেশ কয়েক বছর হলো। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আর বিয়ে করেননি, পুত্র অসীত রায়ের মুখ চেয়ে। দু'তিন বছরের মধ্যে পুত্রকে বিয়ে করিয়ে পুত্রবধূ ঘরে আনবেন এরকম ভাবনা সব সময় করতেন। এবং এটা তার ঘনিষ্ঠ জনদেরও বলে বেড়াতেন। পুত্রকে অর্থনৈতিকভাবে আরও বেশি সচ্ছল করতে চান অতুল রায়। সে লক্ষ্যে ন্যায়-অন্যায়ের দিকে না তাকিয়ে পণ্যে ভেজাল মেশানোসহ দলীয় প্রভাবে নেশা ও মাদকের ব্যবসার দিকে অগ্রসর হলেন। যদিও সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসেবে অতুল রায়ের কোনো কালেই খ্যাতি ছিলো না। পুত্রকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ করার পরিবর্তে ট্রুথ ইজ নো ডিফেন্স শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন। ফলে সনদ সার্টিফিকেট হলো, কিন্তু মানবিকতা লোপ পেলো।

ভোগের পরিবেশে অসীত রায়

নিজেকে জড়িয়ে ফেললো। পরিশ্রমবিহীন উপার্জন ব্যক্তিকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয় এবং তার নীতি-নৈতিকতাবোধ অনেক ক্ষেত্রেই উঠে যায়। অর্থাৎ মানবিকতা লোপ পায় বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই। অসীত রায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অসীত রায় ভাবে পিতা না থাকলে এ বিশাল অর্থ সম্পদের মালিক সে একাই হবে। পিতা জীবিত থাকায় সে এখনো পিতার মুখাপেক্ষী, অন্যথায় সে-ই হতো সর্বেসর্বা। তখন ইচ্ছার স্বাধীনতার পুরোপুরি স্বাদ সে নিতে পারতো।

কিছুদিন পর অতুল রায় জমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে এক নামকরা উকিলের সাথে পরামর্শের জন্য শহরে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তার গাড়ি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে খাদে পড়ে যায়। অতুল রায় ও ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। আর কাগজের ফাইল পানিতে বিলীন হয়ে যায়। খবরের কাগজ তথা মিডিয়ার কল্যাণে অসীত রায় পিতার মৃত্যুর খবর জেনে ঘটনাস্থলে গিয়ে পিতার লাশ শনাক্ত করে।

পিতার মৃত্যুতে অসীত রায় এখন পিতার রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদের মালিক। কিন্তু পিতার ব্যবসা পরিচালনার মতো তার কোনো অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা না থাকায় পদে পদে সমস্যার মুখোমুখি হতে লাগলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার দাম যে কত তা সে বুঝতে পারলো। সে জন্য কাউকে কোনো কিছু না বলে বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে বাড়ির কাছের রেল স্টেশনে মাঝে মাঝে যাতায়াত শুরু করে। সেখানে বিভিন্ন বয়সী ও বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পায় অসীত। যখন ট্রেন স্টেশনে আসে ওঠানামার জন্য অপেক্ষমাণ লোকজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ট্রেন চলে গেলে অল্পক্ষণের মধ্যে কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে যায় সব।

একদা অসীত রায় রাস্তা দিয়ে স্টেশনে আসার সময় এক জ্যোতিষীর (গণকের) দেখা পেল। অসীত রায় গণককে তার হাত দেখে ভবিষ্যৎ জানাতে বললো। গণক তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অসীত রায়কে জানালো যে- তার মৃত্যু হবে মথুরার গয়া কাশী বৃন্দাবনে! কাশী ভারতের উত্তর প্রদেশের বানারস এলাকায় অবস্থিত। হিন্দুদের তীর্থস্থান। সেখানে মৃত্যুবরণ করা অতীব পুণ্যময় হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং এতে অসীত রায় বেজায় খুশি হয়ে গণককে তার যথোপযুক্ত বখশিশ দিল। গণকও এতে খুব খুশি হলো!

অসীত রায় তার ধর্মের পুণ্যময় স্থানে মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী জানতে পেরে পিতার মৃত্যু শোক ভুলে গেল। প্রাচুর্যের গন্ধে খুব অল্প সময়েই অনেক বন্ধু জুটে গেল। ফলে হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজনকে দূরে ঠেলে দিতে খুব বেশি সময় লাগেনি তার। রক্তের গরম, টাকার আধিক্য আর অনৈতিকতায় ভরা ভোগবাদী শরীরকে সাথী করে পূর্বের তুলনায় আরো অধিক মাত্রায় স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করতে থাকে সে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার ব্যবসাপাতি বন্ধ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল সব মূলধনও। এখন সে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত। ফলে বন্ধু-বান্ধব সবাই তাকে ফেলে চলে যায়। এমতাবস্থায় নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে অসীত রায় অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পথ ধরে। ভারাক্রান্ত

হৃদয়ে পথ চলতে চলতে অসীত রায় দূরের এক রেল স্টেশনে এসে থামলো। মনঃস্থির করলো, ট্রেনযোগে কোথাও চলে যাবে। টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়ে অসীত।

ট্রেনের কামরায় তার পাশে ট্রাঙ্কসহ পোশাক-আশাকে স্বগোত্রীয় এক লোক এলো। উভয়ের পরিচয় ও কুশল বিনিময় শেষে বিভিন্ন বিষয়ে কথা শুরু হলো। অসীত রায় তার অতীত ইতিহাস বলতে শুরু করলো। হঠাৎ যাত্রীটি অসীত রায়কে বললো, আপনি আমার ট্রাঙ্কটি দেখুন, আমি পাশ থেকে প্রাকৃতিক প্রয়োজনটা সেরে আসি। অসীত রায় সরল বিশ্বাসে ট্রাঙ্কটি পাহারা দিতে থাকে। ইতোমধ্যে ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা হয়ে যায়। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে যায়। কিন্তু লোকটি ততক্ষণেও আসে না। এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অসীত রায় দোটানার মধ্যে ট্রাঙ্কটি নিয়ে তার সিটে বসে থাকে।

কিছুদূর যাবার পর ট্রেনে মোবাইল কোর্ট তথা তল্লাশি শুরু হয়। এক পর্যায়ে অসীত রায়ের কাছে আসে তল্লাশি টিম। তাকে ট্রাঙ্ক খুলে দেখাতে বলে। সে পূর্বের ঘটে যাওয়া ঘটনাটি উল্লেখ করে এবং বলে যে, ট্রাঙ্কের প্রকৃত মালিক সে নয়। বিধায় তার কাছে ট্রাঙ্কের চাবি নেই। কিন্তু সন্দেহ হয় তাদের। তাই নাছোড়বান্দা চেকাররা ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে ফেলে। চমকে ওঠে সবাই। একটা মানুষের খণ্ডিত মৃতদেহ দেখতে পায় তার মধ্যে। সাথে সাথে অসীত রায়কে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। নরহত্যার এক জঘন্য মামলায় জড়িয়ে দেয় তাকে।

সুসময়ের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনরা

কেটে পড়েছে আগেই। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সহায় সম্পত্তি সব তদারকির অভাবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে। হাজতাবদ্ধ অসীত রায় এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত সে। সরল বিশ্বাসের কারণে জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করালো আজ! আমলি আদালত থেকে মামলাটি যখন বিচারের জন্য দায়রা আদালতে গেলো, তখন মোবাইল কোর্টের (চেকারদের) সাক্ষ্যই আদালতের কাছে গৃহীত হলো এবং আসামি অসীত রায়ের নিজের সাফাই সাক্ষী ধোপে টিকলো না। আদালত বললেন- ট্রুথ ইজ নো ডিফেন্স। ফলে রায় ঘোষিত হলো– দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মৃত্যুদণ্ড।

প্রদত্ত রায়ের (মৃত্যুদণ্ড) কথা চিন্তা করে অসীত রায় ভাবলো– কাশীতে যার মৃত্যু হবার কথা, তার মৃত্যু কেন ফাঁসিতে হবে? ক-বর্ণটি কেন আজ একটু ফাঁকা ফ-বর্ণ হয়ে গেল? সে তো জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ করেনি। তবে তার ফাঁসি হবে কেন? এ কেমন বিচার!

জীবনযুদ্ধের গল্প

দেলোয়ার হোসেন

[গত সংখ্যার পর]

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বকুলতলা থেকে স্যার আমাকে ডাকলেন। চাঁদের আলোয় মিষ্টি ছায়া পড়েছে বকুলতলায়। আমি একটি চেয়ার টেনে বসলাম। স্যার অপ্রয়োজনে একটু হেসে বললেন, সালু ভাই কেমন আছেন? আমি বললাম, ভালো।

স্যারের যে মতলব আছে তা আমি বুঝেছি, তবে মতলবটা কী সেটাই জানার বিষয়।

স্যার বললেন, সালু ভাই আপনি তো গাজী-কালু চম্পাবতীর দেশের মানুষ।

জি।

আচ্ছা ওখানে কি এখনো ফকির-দরবেশ আছে? যারা জাদুটোনা তাবিজ-কবজ করে। মানুষের মন বশীকরণ করে ইচ্ছার অধীন রাখে।

আমার জানামতে সে সব আর নেই।

একেবারেই যে নেই– তা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি বলতে চাচ্ছি– এমন তাবিজ কবজ কি নেই, যা ব্যবহার করলে কোনো মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করবে না। অথবা আমার বাড়ির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। আর কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না আমার।

এমন লোকের কথা আমি জানি না। তবে, একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল আমাদের ওখানে। আমাদের এলাকায় তো–খুব হা-ডু-ডু খেলা হয়। তো সেদিন ছিলো ফাইনাল খেলা। দু'পক্ষই বিভিন্ন এলাকা থেকে হায়ার করে এনেছে ভালো ভালো প্লেয়ার। খেলা

শুরু হলো। দু'পক্ষই বিজয়ের জন্য জীবন পণ করে খেলে যাচ্ছে। তবে এক পক্ষের একজন প্লেয়ারের কারণে অন্য পক্ষ হেরে যাচ্ছে। বিরতির পর আবার শুরু হলো খেলা। কিন্তু হঠাৎ সেই ভালো প্লেয়ারটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সাথে সাথে হুজুরের কাছে নেয়া হলো তাকে। হুজুর তদবির দিলেন আর বললেন, একে বান (জাদু) মেরেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে মারা যেতো। পরে সে ভালো হয়ে যায়।

তাহলে সেই হুজুরকে নিয়ে আসা যায় না?

তিনি মারা গেছেন।

স্যার তখন নিরাশ মনে 'ও' বলে, উঠে চলে গেলেন ভিতরে। আমার খারাপ লাগতে লাগলো এই ভেবে যে, আমি স্যারের কোনো উপকারই করতে পারলাম না।

এ বিষয়টা নিয়ে স্যার কিন্তু মোটেই বসে নেই। একদিন দুপুরে এক ফকিরকে নিয়ে বাসায় এলেন। ফকিরকে দেখেই আমার পছন্দ হলো। এই ফকিরের দ্বারাই এমন কাজ সম্ভব হতে পারে। মনে মনে অবাক হলাম। এই বেটাকে স্যার জোগাড় করলেন কিভাবে।

ফকির সাহেব লম্বায় ছ'ফিট তো হবেই। কাঁচা পাকা বাবরি চুল। শুকনা শরীর। ভাঙা চোয়াল। দাড়ি নেই, তবে মোটা গোঁফে আরো বিশ্রী দেখায়। গায়ের রং ঠিক যেনো কটা মহিষের পিঠ। দু'হাত ভরা তামা-লোহার বায়লা। আঙ্গুলে পাঁচ-ছ'টা পাথরের আংটি। ঘাড়ে একটি ট্র্যাভেল ব্যাগ।

ফকির সাহেব মুখ-হাত ধুয়ে এসে পদ্মাসনে বসলেন খাটের ওপর। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে করলেন কিছুক্ষণ। তারপর দু'হাতে তালি বাজিয়ে ব্যাগ থেকে বের করলেন গাঁজার সরঞ্জাম। স্যার এসে আমাকে দেখিয়ে বললেন, ফকির সাব, এই হলো সালু ভাই। আমার ছোট ভাইয়ের মতো। কোনো কিছুর প্রয়োজন মনে করলে সালু ভাইকে বলবেন। না-না লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

ফকির সাহেব বললেন, স্যার আপনি এসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। প্রয়োজনে সবই বলবো। তা নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

ফকির সাহেবের বলাটা আমার বেশ লাগলো। তিনি নারকেলের সোবার ছোট একটি বল কলকের মাথায় দিয়ে আমাকে বললেন, ভাতিজা একটু আগুন জ্বেলে দেন। আমি যত্ন সহকারে কলকের মাথায় আগুন জ্বেলে দিলাম। ফকির সাহেব কলকে টানতে টানতে শেষবার একটা দম টেনে পেটের মধ্যে আটকে রাখলেন। চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এক সময় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ভাতিজা খানার কথা বলেন।

ভাবী তখনো অফিস থেকে ফেরেনি। ইরানির মাকে খানার কথা বলতেই সে ফকির সাহেবের খানা রেডি করে দিলো। আমি খাবার এনে ফকির সাহেবের সামনে রাখলাম। ফকির সাহেব হাতের ওপর পানি ঢেলে চারদিকে ছিটালেন। প্লেটের একদিকে কিছু সাদা ভাত লবণ দিয়ে মেখে মুঠা করে, সেই হাতটা দু'পায়ের বুড়া আঙ্গুলে ছুঁইয়ে পাশেই একটা কাগজের ওপর রেখে দিলেন ভাতের মুঠা।

বিষয়টা আমার ভালো লাগলো না। আমি বললাম, এটা কী করলেন?

তার জন্য রেখে দিলাম।

কার জন্য?

ভাতিজা এতো তাড়াতাড়ি ভাতও ফোটে না। আপনি এখনি থলের খবর নিতে চান! কি হতে কি হয়ে যায় ভেবে আমি আর এ নিয়ে প্রশ্ন করলাম না। শুধু দেখে যাচ্ছি। মাছ-মাংস, ডাল-ভাজি একত্রে মাখিয়ে ফকির খেয়ে নিলেন। প্লেটে পানি ঢেলে হাত ধুয়ে প্লেট ধুয়ে সেই পানি চুমুক দিয়ে খেলেন। সারা মুখে ভিজা হাতের প্রলেপ মেখে শুয়ে পড়লেন তিনি।

সন্ধ্যার পর ফকির সাহেবের সাথে স্যার কথা বললেন একান্তে। সে সব কথা যে বশীকরণ সম্পর্কিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সকালে স্যার এবং ভাবী নয়নকে নিয়ে অফিসে চলে গেলেন। ফকির সাহেব নাস্তা শেষ করে একটুকরা কাঠের ওপর গাঁজার পাতা রেখে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে হাতের তালুতে ডলাই-মলাই শুরু করলেন। তারপর ঝরঝরে চা পাতির মতো করে কলকের মধ্যে ঢেলে বললেন, ভাতিজা আগুন জ্বালেন। যথা আজ্ঞা বলে কাজে লেগে গেলাম। ফুঁ দিতে দিতে একটু ধোঁয়া বেরোতেই ফকির সাহেব বললেন, টান লাগান।

আমি? আমার অভ্যাস নেই। শেষে মাথা ঘুরে পড়ে যাবো।

কিচ্ছু হবে না। দম দিয়ে পেটের মধ্যে আটকে রাখেন।

তাতে কী হবে?

মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পরিষ্কার হবে মানে? মাথা ঘুরে বুদ্ধিসুদ্ধি তো সব খিচুড়ি হয়ে যাওয়ার কথা। এ আমি পারবো না।

আরে ভাতিজা, আমার ডেরায় কত ধরনের কতো বড় বড় মানুষ আসে। কবি সাহিত্যিকরাও আসে। মাথায় নাকি বুদ্ধি খেলে না। কিন্তু এই কলকেয় দু'চার টান দিয়েই মাথা পরিষ্কার। তখন গড় গড় করে বুদ্ধির চাকা ঘুরতে শুরু করে।

মনে মনে ভাবতে লাগলাম বুদ্ধির চাকাতো আমারো ঘোরা দরকার। যাও বা একটু নড়াচড়া করতো, এই চার পাঁচ বছরে সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেছে। এ সব ভেবে চিন্তে, কষে একটা দম দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখলাম। একটু পরই একটা ধাক্কা দিয়ে মাথার যন্ত্রপাতি বুঝি ঘুরতে শুরু করলো। আরেকটু পর বুঝলাম শুধু মাথা নয়, স্যারের বাড়িঘরও ঘুরতে শুরু করেছে। আমি যেনো মহাশূন্যে, গ্রহ-নক্ষত্রের দেশে চলে যাচ্ছি।

টলতে টলতে পাশের ভাড়াটিয়া ভাবীর ঘরে চলে গেলাম। আমাকে দেখেই ভাবীর বুঝা সারা। খাটের এক পাশে শুয়ে পড়লাম আমি, ভাবী ফুলস্পিডে ফ্যান চালিয়ে দিলেন। তারপর মনে হতে লাগলো ঝিরঝির শব্দে একটা ঢেউ পা থেকে গড়াতে গড়াতে মাথায় উঠে যাচ্ছে। আবার মাথা থেকে নেমে আসছে পায়ের পাতায়। এভাবে পৌনে এক ঘণ্টা ধরে সারাটা শরীর ওয়াশ হওয়ার পর আমি গাঁজার হাত থেকে রেহাই পেলাম।

ফিরে গেলাম ফকির সাহেবের কাছে। বললাম, স্যার যে কাজের জন্য নিয়ে এসেছেন সে কাজ হবে তো?

সেই কাজই তো করছি। দয়াল মুখ তুলে চাইলেই হবে।

তখন আমার মনের মধ্যেও কিছু একটা চাওয়ার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হতে লাগলো। আর এই বিশ্বাসও জন্মালো যে, চাইলেই যখন পাবো, তখন কী চাইবো সেটাই স্থির করতে পারছিলাম না।

ফকির সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, আপনি তো রাজকন্যার সাথে রাজ্যও পেতে যাচ্ছেন। এই দশ কাঠা জমির পাঁচ কাঠা তো আপনার।

আমি ফকিরের কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। বললাম, আপনি এসব কী বলেন!

যা সত্যি তাই তো বললাম।

তার মানে?

আপনার স্যারের এক বোন আছে না। বয়স হয়েছে, এখনও বিয়ে হয়নি। স্যারের এক ভাইয়ের বাসায় থাকে।

শুনেছি দেখি নাই। কানা না খোঁড়া তাও জানি না।

একদিন দেখে এলেই তো হয়।

দেখে আর লাভ কী? কানা খোঁড়া হলেও আমার সাথে বিয়ে দেবে না।

কেনো দেবে না? ছেলে হিসাবে আপনি কি খারাপ? আপনার মতো ছেলে লাখে একটা মেলে।

কথাটা শোনার পরই আমার ইচ্ছে করতে লাগলো, ভাবীর ঘরে গিয়ে একবার আমার চেহারাটা ভালো করে দেখে আসি। কিন্তু ফকির সাহেব আবার বললেন, আপনাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দেবো। মন্ত্রটা অবশ্য সব খানেই খাটানো যাবে। আমি বললাম, তাহলে তাই শিখিয়ে দেন।

কালী সন্ধ্যায় একটা রক্তজবা ফুল তুলে এক নিঃশ্বাসে মন্ত্রটা তিনবার পড়ে ফুলের ওপর ফুঁ দিতে হবে। ফুলটা কখনো নিচে রাখবেন না। সেই ফুল হাতে নিয়ে সাত দিন তার সামনে যাবেন। ব্যস! তারপর সে নিজে এসে আপনার সাথে কথা বলবে।

এই শহরে রক্তজবা ফুল পাবো কোথায়?

খুঁজলে বাঘের চোখও মিলানো যায়। আর এতো সামান্য একটা রক্তজবা।

তারপর থেকে এ গলি সে গলি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগলাম কোথায় রক্তজবা ফুল গাছ আছে। শেষে খুঁজতে খুঁজতে একটা দেয়াল ঘেরা একতলা বাড়ির পিছন দিকে রক্তজবা ফুল দেখতে পেলাম। এবার মন্ত্রটা ঠোঁটস্থ করতে শুরু করলাম। আমাকে বিড়বিড় করতে দেখে ভাবী একদিন বললেন, সালু ভাই কি আগামী বছর সত্যি পরীক্ষা দেবেন?

জি ভাবী।

ভালো।

মনে মনে বললাম, ভালো হলেই ভালো। কী যে কঠিন পরীক্ষা তা যদি একবার জানতেন।

কালী সন্ধ্যায় অলি-গলিতে লোক চলাচল বেশ কমে যায়। দেখে শুনে একদিন সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়লাম সেই বাড়ির মধ্যে। বড় বড় পাতা বাহার আর রজনীগন্ধা

গাছের আড়াল দিয়ে পৌঁছে গেলাম রক্তজবা গাছের কাছে। চোখের পলকে একটা ফুল ছিঁড়ে, একদমে মন্ত্রটা তিনবার পড়ে ফুলের ওপর ফুঁ দিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। এই কাজটা যে কিভাবে সম্পন্ন হলো, তা আমি নিজেও বলতে পারবো না। তবে এ কথা মনে হলো যে, গাঁজা আমাকে সত্যি ওয়াশ করে এগিয়ে যাওয়ার চোখ খুলে দিয়েছে।

বিনিময়ে ফকির সাহেব একদিন আমার কাছে এক বোতল কোক খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তার আশা পূরণ করলাম। ভাবলাম আমার আশাও হয়তো পূরণ হবে। পরদিন ফকির সাহেব চলে গেলেন।

কয়েকদিন পর স্যার বাসায় ফিরে রাগে যেনো ফেটে পড়তে লাগলেন।

সব শালা ভণ্ড ফকির। কাজের নামে ঘণ্টা। ভণ্ডটা যে বললো, আপনার মুখের ওপর কেউ কথা বলতে সাহস করবে না। বেটা ভণ্ড!

পরদিন সন্ধ্যায় স্যারের অফিসের পিয়নের কাছে জানতে পারলাম, কোনো এক অভদ্র পাওনাদার স্যারের অফিসে গিয়ে স্যারকে যাচ্ছে তাই বলে গিয়েছে।

স্যার গাঁজা খান না ঠিকই, কিন্তু এ কথা সত্য যে, স্যারের বুদ্ধির সবকটা দরজাই রয়েছে খোলা। দু'দিন পর তিনি আর একজন ফকির নিয়ে এলেন বাসায়। তবে ইনি ফকির নয়- দরবেশ কিসিমের মানুষ। সাদা চুল দাড়ি, দেখতেও সুন্দর আর খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। লোকটা আল্লাহর পবিত্র কালাম দিয়ে তদবির করেন।

স্যার সগর্বে ভাবীকে বললেন, নয়নের মা, এই হলো খাঁটি লোক। ভাইজানের চেহারা মোবারক দেখলেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। ভাবী বললেন, ভাইজানকে কি সালাম করবো?

তা করতে পারো। ধরে নাও, এখন থেকে ভাইজানই আমাদের মুরব্বি।

রাতে লক্ষ করলাম, উনি প্রায় সারা রাতই দোয়া দরুদের মধ্যে কাটালেন। ভোররাতে ফজরের নামাজ পড়ে কখন যে ঘুমিয়েছেন, তা আর আমি জানি না। বেলা আট-টার দিকে তিনি উঠলেন। তারপর নাস্তা খেয়ে কিছু বিশেষ জিনিসপত্র কিনতে বেরিয়ে গেলেন। পরদিন মাগরিবের নামাজের পর বাড়ির গেট থেকে শুরু করে দশ হাত অন্তর অন্তর একটা করে তাবিজ পুঁতে দিলেন রাস্তায়। লম্বা একটা ছুরি হাতে খুঁড়া-খুঁড়ির কাজে আমি সাহায্য করলাম। পোলাও-গোশত খেয়ে একদিন তিনিও বিদায় নিলেন।

ঝিলপাড়ের বস্তি থেকে একজন পাগল লোক প্রায়ই নিজের হাতে ধরা তাজা মাছ দিয়ে যেতো স্যারের বাসায়। সেই লোকটা একদিন বিশেষ এক মহিলার খোঁজ দিলো। মহিলাটি নাকি এমন সব তন্ত্রমন্ত্র জানে, যা চুম্বুকের মতো সাথে সাথে কাজ করে। মন উল্টা-পাল্টা করা কোনো ব্যাপারই না।

যাহোক, একদিন বিকালে বাসার সবাই মিলে গেলাম ঝিলপাড়ের সেই মহিলার বাড়িতে। গাছ-গাছালির ছায়ায় মোড়া পেতে বসে স্যার বর্ণনা করলেন নানাবিধ সমস্যার কথা। মহিলা অনেকগুলো গাছ দেখিয়ে বর্ণনা করলো তার গুণাগুণ। তারপর বললো, ভাই সাহেব! আপনি গরিবের বাড়িতে এসেছেন বলে আমি ধন্য হয়েছি। তবে একটা

কথা, এসব কাজ করার ক্ষমতা আমার আছে কিন্তু আমি করি না। যদি করতাম, তাহলে আপনার মতো দশ কাঠা জায়গার মালিক আমিও হবার পারতাম। পরের ক্ষতি করে কোনো দিন সুখ পাওয়া যায় না।

আমি একটু দূরে থাকলেও মহিলার কথাগুলো আমার কানে এলো। ভাবলাম এক্ষুনি একটা ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু না, স্যার একটুও রাগ করলেন না। আরো নরম সুরে বললেন, এই মহব্বতজানের মতো গরিব মানুষ ঢাকা শহরে আর একটিও নেই। আপনি কাজ করলে পারিশ্রমিক পাবেন। আমি কি করি বা না করি তা আপনার ভাববার বিষয় নয়। তারপর আরও কিছুক্ষণ পর আমরা ফিরে এলাম বাসায়।

শহরে সব ধরনের জ্ঞানী গুণীদের সাথেই স্যারের আলাপ পরিচয় আছে। সাংবাদিকসহ রেডিও টিভির লোকজনও আসেন স্যারের বাসায়। ভদ্র লোকেরা চা-বিস্কুট খেয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে গল্পে গল্পে বিকাল থেকে রাত আট-টা পর্যন্ত কাটান। যে কারণে তাদের সাথে আমারও বেশ ঘনিষ্ঠতা বাড়লো।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, সালু ভাই কি কিছু করার চিন্তা-ভাবনা করছেন?

আমি বলি, কী করবো? স্যার আছেন, স্যার যা ভালো মনে করবেন তাই করবো। স্যার বললেন, এই সমাজের ভালো ছেলেদের কি আর ঠাঁই আছে। চোর-ছ্যাঁচড় মিলে দেশ চালাচ্ছে। সালু ভাই করলে বড় কিছুই করবে। আরে মহব্বতজান তো এখনো বেঁচে আছে।

রেডিওর জামান সাহেব বললেন, সালু ভাইয়ের কণ্ঠটা বেশ।

তারপর আমাকে বললেন, আপনি কি কখনো অভিনয় করেছেন?

হ্যাঁ করেছি। স্কুলে একবার আমাকে নায়িকার পাঠ করতে হয়েছিলো। কী যে পিচ্ছিল শাড়ি পরালো। স্টেজের ওপর ঘুরতে ফিরতে শাড়ি গেলো খুলে। শেষে ...। কথা শেষ করতে পারলাম না। হো হো শব্দে হেসে উঠলো সবাই। ভাবী বললেন, সালু ভাই, আপনি নায়িকার পাঠ করেছিলেন, কই, একথাতো কোনো দিন বলেননি।

কী বলবো? এসব কি একটা বলার কথা? তো আরেকবার একটা নাটক করতে গিয়ে দেখা গেলো বইটার মাঝখানের পাঁচ-ছটা পাতা নেই। অথচ বইটা ভালো। আমি তখন কলেজে পড়ি। কি আর করা। স্কুলে পরীক্ষার সময় কতই তো শূন্যস্থান পূরণ করেছি। তাই ভাবলাম দেখি না কী করা যায়। তো বইটা ভালো করে দু'একবার পড়লাম। তারপর শূন্যস্থান পূরণ করে দিলাম। হলোও ভালো।

আমার কথা শুনে কেউ বললেন, বাঃ চমৎকার একটা ঘটনা শুনলাম। কেউ বললেন, আমাদের সালু ভাই তাহলে নাট্যকারও বটে। স্যার বললেন, গ্রামের ব্যাপার তো, ভিড়ের মধ্যে বাছুর পরামানিক। আমি তো আছি।

রেডিওর ভদ্রলোক বললেন, মহব্বত ভাই আপনি যাই বলুন, সালু ভাইয়ের এই কাজটি কিন্তু বিরাট ব্যাপার। তারপর আমাকে বললেন, আপনি যদি রেডিওর নাটকে অভিনয় করতে চান তো আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।

হাতের মোয়া সময় করে খেলেই হলো। এরকম ভাব-সাবের মধ্যে কেটে গেলো দেড় মাস। তারপর একদিন দেখা করলাম। ভদ্রলোক বললেন, সালু ভাই এতো দেরি

করলেন যে! আমি তো কবেই আপনার বরাবর চিঠি পাঠিয়েছি। একটা চরিত্রে আপনাকে সিলেক্ট করেছিলাম। শেষে না দেখে অন্য একজনকে দিয়ে করানো হলো। আমি বললাম, সে চিঠি আমার হাতে পৌঁছেনি।

যাহোক–একদিন দুপুরে চিঠিটা খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম স্যারের বেডের নিচে। মনের মধ্যে কাদাকাদা কষ্ট এসে জমলো। যা বেশ ঘন এবং বিশ্রী, ভাবলাম এই মহব্বতজানের মহব্বতে পড়ে থাকলে আমি কোনোদিন পথের সন্ধান পাবো না। স্যার আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন ঠিকই, তবে বিনা পয়সায় একজন বিশ্বাসী এবং নির্বোধ কেয়ার টেকার পেয়েছেন। সেই বিশ্বাসী লোকটা হাত ছাড়া হয়ে গেলে কী ক্ষতি হবে তা মহব্বতজান ভালোই জানেন।

মনে মনে ভাবি, সবাই এক কপাল নিয়ে জন্মায় না। কত বিচিত্র, মানুষের এই জীবন–নাটক, সে কথা ভাবার সময় কোথায় মানুষের। প্রতিটি মানুষই বুঝি মরণের আগ পর্যন্ত সেই নাটকেরই জন্ম দিয়ে যাচ্ছে।

স্যারের এই মানসিকতা বুঝেও আমি অবুঝের মতো রয়ে গেলাম। স্যারের সংগ্রহে প্রচুর বই। স্যার পড়ার সময় না পেলেও আমি পড়ে যেতে লাগলাম নিয়মিত। বই এর মধ্যে পথ খুঁজি। বই একমাত্র প্রকৃত বন্ধু, যে ছলনা জানে না। যে মিথ্যা বলে না।

প্রায় চার মাস পর বিশেষ একটা কারণে আমার মনটার মধ্যে বেশ খুশি খুশি লাগতে লাগলো। এই খুশির বিষয়টা স্যারকে জানানো দরকার বলে মনে করলাম। পরদিন সন্ধ্যায় স্যারকে বললাম, স্যার জাহাঙ্গীর চৌধুরী আমার বইটা নিতে চায়।

বই! কী বই?

জীবনযুদ্ধ।

জীবনযুদ্ধ মানে?

হ্যাঁ- জীবনযুদ্ধ। আমার লেখা। বইটা আমি তাকে পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি পড়েছেন। আমি বইটা আনতে গেলে তিনি বললেন, বইটা আমাকে দেন। আমি একটা সামাজিক ছবি তৈরি করি। কাহিনীটা খুবই ভালো।

স্যার অনেকক্ষণ দম ধরে থেকে বললেন, আরে ভাই কতো চৌধুরী দেখলাম। সব টাউট-বদমাশ। বইটা নিয়ে সে নিজের নামে চালাবে। ছবি হিট হলে লাখ লাখ টাকা কামাবে, আপনাকে দেবে কচুটা। বইটা যে আপনার সে কথা বলতে গেলেও বিপদে পড়বেন আপনি। আপনার পাশে কেউ আসবে না। কারণ, আপনি লেখক নন, জাহাঙ্গীর সাহেব একজন লেখক এবং পরিচালক। বইটা লিখেছেন- থাক। সময় এলে সবই হবে। এ নিয়ে চিন্তা করবেন না।

দারুণ সত্যি কথা। স্যারের কথায় মনে হতে লাগলো, ওহ! কী বাঁচা বেঁচে গেলাম। স্যারকে কথাটা না বললে তো- মস্তবড় ভুল করতাম। কিন্তু কিছুদিন পরই বুঝলাম, স্যারকে বলেই আমি মস্তবড় ভুল করেছি।

সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। বয়ে চলে আপন গতিতে। আমি রয়ে গেলাম আমার জায়গাতেই। একদিন আবার দেখা হয়ে গেলো আতিয়ারের সাথে। আমি ওকে চিনতে চাইলাম না। কিন্তু আতিয়ার বললো, সালু কেমন আছিস?

ভালো।

পরীক্ষা দিয়েছিলি?

না।

এখন কী করছিস?

আমার কথা বাদ দে। তুই কেমন আছিস তাই বল।

আর বলিস না, ছেলেটা আমাকে পাগল করে ছাড়বে।

ফুটফুটে একটি ছেলে দেখে বললাম, এই তোর ছেলে? বয়স কতো?

পাঁচ বছর। এতো দুষ্টু...। চল আমার বাসায় যাই। এই তো ধানামন্ডি লেকের ওপাড়েই।

সে তো বেশ দূর।

আমার গাড়ি আছে, তোকে পৌঁছে দেবো।

আমি যাবো- এই ভাবে?

তাতে কী? তুই আমার সহপাঠী। স্কুল-কলেজে এক সাথে পড়েছি।

আজ থাক- অন্য একদিন দেখা যাবে।

রাতে আর ঘুম আসে না। ছটফট করতে করতে দরজা খুলে বকুলতলা এসে বসলাম। চারদিকে নিঝুম। চাঁদ নেই। আঁধারের মিষ্টি ছোঁয়ায় এতোই ভালো লাগছিলো যে, দূরের বিজলি বাতি তখন- অসহ্য লাগতে লাগলো। শরীরটা চেয়ারে এলায়ে চোখ বন্ধ করলাম। কিন্তু মন কেবলি আতিয়ারের দুষ্টু ছেলেটাকে ঘিরে মায়ার সুতা ছড়াতে লাগলো। মনে হতে লাগলো ছেলেটাকে আর একবার দেখি। ওর বুকটা আমার বুকের মধ্যে নিয়ে খুব আদর করি। কিচ্ছু ভালো লাগে না। আমার বুকের মধ্যে এই যে কেমন কেমন লাগছে, আমাকে দেখে আতিয়ার কি তা বুঝতে পারবে?

কখন যে দুচোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করেছে তা বুঝতেও পারিনি। চোখ মুছে ভাবলাম, একদিন আতিয়ারের বাসায় যাবো। আমি যেমনই হই না কেনো– সবচেয়ে বড় সত্য যে, ও আমার স্কুল এবং কলেজ জীবনের বন্ধু। কিন্তু ওর বাসার ঠিকানা তো– জানি না। তাহলে...

কয়েকদিন পরের ঘটনা। নয়নের প্রাইভেট টিচার এলেন ঠিক সন্ধ্যার দিকে। পড়াতে নয়, পড়ানোর টাকা নিতে। নয়ন সামনে এস.এস.সি পরীক্ষা দেবে। তাই ভার্সিটির এক তুখোড় ছাত্রকে পড়ানোর জন্য ঠিক করা হয়েছিল। অনেক দূর থেকে এসে পড়িয়ে যেতো সে। কথা ছিলো পরীক্ষা চলার মধ্যেও সে লেগে থাকবে। কিন্তু প্রায় ছ'মাস পর টাকা-পয়সা নিয়ে লেগে গেলো গোলমাল। এই ক'মাসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এক মাসের টাকাও পায়নি শিক্ষক।

ঘটনাটা তাহলে শুরু থেকেই বলি।

পড়ানোর ব্যাপারে টিচারের সাথে আলোচনা হতেই মহব্বতজান অর্থাৎ, আমার স্যার বলেছিলেন, টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি ভাববেন না। বিদ্যা দানের চেয়ে মহৎ কাজ কি আর আছে। অন্য জায়গায় যেমন সম্মানী পান আমি তাই দেবো, তবে আমার নয়নের জন্য আপনি দু'চার মিনিট একটু বেশি ব্যয় করবেন। মহব্বতজানের ব্যবহার,

নাস্তা-পানি এবং মাঝে মাঝে রাতের ভূরিভোজে প্রাইভেট টিচার তো-স্যারের প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ। মাস শেষ হলো কিন্তু পুরা মাসের টাকা সে পেলো না। কিছু হাত খরচা দেয়া হলো টিচারকে।

স্যার বললেন, একটু অসুবিধা আছে। এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। দু'চার মাস গেলেই টাকাটা এক সাথে পেলে আপনার উপকার হবে। মনে করুন টাকাটা আপনার পকেটেই রয়েছে।

এর ওপর আর কথা থাকতে পারে না। তো, সেভাবেই কেটে গেলো ছয় মাস। টিচার বললেন, এবার আমার টাকাটা দিয়ে দিন। আমি নয়নের জন্য অনেক করেছি। ওর জন্য একটা ছাত্রকে আমি বাদও দিয়েছি। এই ছ'মাসে চব্বিশ হাজার টাকা। তার মধ্যে দিয়েছেন পাঁচ হাজার।

আমার স্যার বললেন, এটা কি মগের মুল্লুক। চা-নাস্তা খেয়ে, বসে বসে একঘণ্টা পার করেই চার হাজার টাকা। আপনার মতো মাস্টার আমার দরকার নেই। আমার ছেলে আর আপনার কাছে পড়বে না। আপনি এখন যেতে পারেন।

এই নিয়ে ভীষণ চেঁচামেচি। আমি শুধু শুনছি আর ভাবছি। প্রাইভেট টিচার যতো না গরম তার চেয়ে অধিক গরম আমার স্যার। শেষে ধীরে ধীরে টিচারও গরম হতে শুরু করলো। ভার্সিটির সেরা ছাত্র বলে কথা। আমার মনে হলো, এই গরম হাওয়ায় সেও দেখতে পেলো মহব্বতজানের আসল চেহারা। সে যাই হোক, টিচার পরিশ্রমের টাকা খোয়াতে রাজি নয়।

শেষে এই কথা হলো যে, ঠিক একমাস পর এসে আপনার টাকা আপনি নিয়ে যাবেন। টিচার বললো, ঠিক আছে। আমি এক মাস পরই আসবো। সেদিন কিন্তু টাকা না নিয়ে আমি যাবো না।

আজ সেই টাকা নেয়ার দিন। আমি জানতাম টিচার আজ আর স্যারের মিষ্টি কথায় গলবে না। এদিকে স্যারের কোনো অনুচ্ছেদেই কাউকে কোনো টাকা দেয়ার কথা লেখা নেই, এটা আমি বেশ বুঝেছি। অবস্থা যে খারাপের দিকে যাচ্ছে, এটা ভেবে আমি শঙ্কিত।

এমন সময় স্যার আমাকে ডেকে বললেন, সালু ভাই দু'প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসেন।

অবস্থা বুঝেই আমি দ্রুত দোকানের দিকে ছুটলাম। ফিরে এসে দেখি কারবার যা

হবার হয়ে গেছে। বকুলতলা থেকে রাস্তা পর্যন্ত ভিড় করে আছে প্রতিবেশীরা। আমার স্যার অর্থাৎ, মহব্বতজানকে চক্ষু হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা চলছে। নয়নের প্রাইভেট টিচারের একটা ঘুষিতেই আমার স্যারের বাঁ চোখের বারোটা বেজে গেছে। উঠোনে ছিটকে পড়ে কোমরে প্রচণ্ড ব্যথাও পেয়েছেন।

প্রতিবেশীদের মুখ দেখে মনে হলো ঘটনার অন্তরালের ঘটনা শুনে ভদ্রেরা লজ্জায় দুর্বল হয়ে গেছে। তবে, মহল্লার মধ্যে এসে একজন নামিদামি সমাজসেবকের গায়ে হাত তোলা এটা মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু মেনে তাদের নিতেই হয়। কেননা, প্রাইভেট টিচার আঁটসাঁট বেঁধেই এসেছে। পনেরো বিশজন ছাত্র-যুবক রাস্তায় দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় স্যারকে গালমন্দ করছে। তাঁর চরিত্রের বিশ্লেষণ করছে। শুনে আমারই মাথা ঘুরে উঠলো। ভাবলাম, এরা এতসব তথ্য জোগাড় করলো কোথা থেকে।

দু'তিন দিনেই স্যার সুস্থ হলেন। তবে, বাঁ চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা। এখন আর সিগারেট জ্বালানোর সময় যত্ন করে বাঁ চোখ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না স্যারের। হলে কী হবে- কেমন জানি অশান্তি বোধ করেন স্যার। মনের দুঃখে ভাবী একদিন রাগ করে স্যারকে বললেন, তোমার স্বভাবটা এবার পাল্টাও। পাড়ার ভদ্রলোকদের কাছে মান-সম্মান কিছু থাকলো?

কে ভদ্রলোক? ঐ সব ঘুষখোররা? নয়নের মা, চার-পাঁচ তলা বাড়ি বানালেই সে ভদ্রলোক হয় না।

থাক। তুমি আর কথা বলো না।

কিন্তু স্যারের যতো রাগ গিয়ে পড়লো- ফকিরদের ওপর। স্যার উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে বললেন, সব শালা ভণ্ড। বেটাদের পেট ফাড়লে 'ফ' খুঁজে পাওয়া যাবে না, আবার ফকির কওলায়। ভাবী বললেন, ডা: সাহেব তোমাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছেন। আমিও ভাবীর কথায় সায় দিয়ে বললাম, ভাবী ঠিকই বলেছেন। চোখ নিয়ে খেলা করা ঠিক না। সৃষ্টিকর্তা এই অমূল্য ধন একবার দান করেছেন, নষ্ট হলে তিনি আর দেবেন না। শুধু একটা জিনিসই তিনি দু'বার দান করেন।

সে আবার কী জিনিস? স্যার প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, দাঁত। দুধের দাঁত পড়ে গেলে তিনি হাড় চাবানোর জন্য নতুন করে আবার দাঁত দেন। কিন্তু আমরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্তবা বুঝি না।

সপ্তাহখানেক পর কুমিল্লা থেকে ভাবীর চাচাতো ভাই আর বোন মিলে চারজন মেহমান এলো বাসায়। তখনো স্যারের চোখ লাল। চোখে ড্রপ চলছে। শালীরা বলল, দাদা বাবু আপনার চোখে কী হয়েছে? স্যার বললেন, তেমন কিছু না।

কিছু না মানে, কদম ফুলের মতো লাল হয়ে আছে।

কথা শুনে স্যার হেসে উঠলেন। ভাবী অন্য ঘর থেকে বললেন, ওই তোরা কি কস্। কদম ফুল কি লাল রে? শালীরাও একযোগে হাসতে হাসতে বললো, দিদি রক্তজবা ফুলের নাম মনে আসছিলো না তো, তাই কদম ফুল বলে ফেলেছি।

শালীদের মধ্যে একজনের বিয়ে হয়েছে, আর একজনের এখনো হয়নি। কলেজে পড়ছে। দু'জনই প্রচণ্ড রসিক। আমার রুমটা বেশ বড়, দু'দিকে খাট পাতা। টেবিল ও

দু'তিনটা চেয়ার রয়েছে। নয়ন মাঝে মাঝে এখানে পড়াশুনা করে। তো মেহমানরা আমার খাটে বসেই আড্ডা দিচ্ছে। আমি বকুলতলা বসে যাযাবরের সুনন্দা আর আধারকারের মিষ্টি প্রেমের সৌরভে ভাসছি। তবে ওদের টুকরো টুকরো কথা আমার কানে আসছে।

কলেজপড়ুয়া মেয়েটি বলছে, নয়ন তো এবার পরীক্ষা দিচ্ছিস।

নয়ন বললো, অবশ্যই দিচ্ছি।

ঐ লোকটা তোদের এখানে থাকে?

হ্যাঁ।

তোর মাস্টার?

না। সালু চাচা অনেক দিন ধরে আমাদের এখানে। বাড়িতেও যায় না।

লোকটা কী করেরে?

কিচ্ছু না। তবে, সালু চাচা খুব ভালো লেখে। জীবনযুদ্ধ নামে একটা বই লিখেছে চাচা। এক পরিচালক বলেছে, বইটি সে সিনেমা করবে।

এর মধ্যেই স্যার ভিতর থেকে জামা-কাপড় পরে এসে নয়নকে বললেন, বাপ আমি ডাক্তারের ওখান থেকে ঘুরে আসি। তুমি তোমার খালাদের সাথে গল্প করো। ভাবী এগিয়ে এসে বললেন, কাজ শেষ হলেই সোজা বাসায় চলে এসো।

সন্ধ্যায় ছায়া নেমেছে। ভাবী বকুলতলা এসে বললেন, সালু ভাই, দোকান থেকে মুড়ি আর চানাচুর নিয়ে আসেন। আমি দোকান থেকে মুড়ি-চানাচুর এনে ইরানির মায়ের কাছে দিয়ে বকুলতলা বসলাম। ভাবী তখন বোনদের নিয়ে আমার রুমটাতে গল্প করছে।

বড় মেয়েটা বলছে, দিদি তোমাদের তো টাকা পয়সার অভাব নেই। এতো জায়গা, বিল্ডিং করো না কেনো? ভাবী বললেন, সময় যখন হবে, তখন অবশ্যই করবো। এতো তাড়াহুড়া কেনো। কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি বললো, তোমাদের তো মাত্র দু'টি ঘর, আর সবই তো ভাড়া দিয়ে রেখেছো। রাতে আমরা থাকবো কোথায়?

ভাবী বললেন, কেনো এই ঘরে থাকবি।

ঘর একটা হলেও খাটতো দুটোই আছে।

রাতে আমি চলে গেলাম পাশের বাড়ির প্রফেসরের বাসায়। প্রফেসর ব্যাচেলর। বড় একটি টিনের ঘরে সে একাই থাকে। পাশে আরো দু'তিন ঘর খ্রিষ্টান পরিবার।

প্রফেসর হাসতে হাসতে বললেন, কী খবর সালু ভাই?

আমি বললাম, ভালো।

বাড়িতে অনেক মেহমান দেখলাম।

দেশ থেকে ভাবীর বোনরা এসেছে।

প্রফেসর সাহেব নিজেই রান্না করে খান। লিকলিকে মানুষ, মেপে-ঝুকে পা ফেলেন। কিন্তু দারুণ রসিক। তিনি রস ভোগ করেন ঠিকই, তবে ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থা। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, সালু ভাই কেমন বুঝতাছেন, খেল কিন্তু মাত্র শুরু হলো। ফকির দরবেশ দিয়ে কুলাইবো না। আমি বলি কি আপনি কেটে পড়েন। উটকো

ঝামেলা আপনার ঘাড়ে এসেও পড়তে পারে।

কথা মিথ্যা নয়। তবে, আমি যাবো কোথায়? কোনো রকম একটা কাজ যদি পেয়ে যেতাম, তাহলে আর ভাবনা থাকতো না।

প্রফেসর বললেন, আমার কলিগ মিসেস করিমের ওখানে আপনাকে আমি রেখে দিতে পারি। উনার তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, ওদের একটু আগলে রাখতে হবে। থাকা খাওয়া ফ্রি।

আমি বললাম, সেই একই কথা। বাঘের খোঁয়াড় থেকে সিংহীর খোঁয়াড়ে যাওয়া।

তাহলে হুদা সাহেবের সাথে একটু কথা বলে দেখি।

তিনি কী করেন?

নবকাল পত্রিকার মালিক। ওখানে যে কোনো কাজে ঢুকতে পারেন। আমার মনে হয়- আপনার উপকার হবে। একদিন খুব বড় মাপের লেখকও হয়ে যেতে পারেন।

তাহলে ওখানেই একটু চেষ্টা করে দেখেন। আপনি একটু জোর দিয়ে বললে তিনি হয়তো না করতে পারবেন না।

তারপর সত্যি একদিন হুদা সাহেবের পত্রিকায় আমার চাকরি হয়ে গেলো। যাওয়ার সময় স্যারকে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি।

স্যার আমার দিকে তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। ভাবী বললেন, কোথায় যাচ্ছেন?

এখন ঠিক বলতে পারবো না। তবে বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।

স্যার বললেন, ঠিক আছে যান। তবে অসুবিধা হলে আবার চলে আসবেন। আরে এই মহব্বতজান যতো দিন বেঁচে আছে, ততদিন আপনার দুয়ার খোলাই থাকবে।

ভাবী বললেন, আমি যে মনে মনে কতো আশা করেছিলাম।

আমি বললাম, ভাবী মানুষের সব আশা কি আর পূরণ হয়?

পুরনো ঢাকায় হুদা ভাইয়ের তিন তলা বাড়ি। নিচে কাগজের গোডাউন। দোতলা তিন তলা জুড়ে উনি থাকেন। দোতলায় ব্যক্তিগত একটা অফিস রয়েছে তার। আমার আদ্যপান্ত তিনি শুনলেন এবং আমার দু'একটি লেখাও তিনি দেখলেন। শেষে বললেন, আরে ভাই কোথায় কোন্ ম্যাসে গিয়ে থাকবেন আপনি। দরকার নেই। আমার বাড়িতে থাকার জায়গার কি অভাব আছে? আর স্যার স্যার বলে কাজ নেই। হুদা ভাই বললেই হবে।

থেকে গেলাম। শুরু হলো অন্য এক জীবন। হাতে এলো প্রচুর স্বাধীন সময়। হুদা ভাইয়ের উৎসাহে লেখালেখি চলতে লাগলো ঝড়ের গতিতে। নামে বেনামে প্রকাশ হতে লাগলো সে লেখা। হুদা ভাই চতুরতা জানেন না। কারো জন্য কিছু একটা করতে পারলে তিনি সত্যিকারের সুখ অনুভব করেন। এটা আমি বেশ লক্ষ করেছি।

প্রায় এক বছর পর হুদা ভাই একদিন আমাকে ডেকে বললেন, সালু ভাই, আপনার একটা সুখবর আছে। জীবনে এই প্রথম এমন একটি দুর্লভ শব্দ আমার কানে এলো। আমি তখন ভাবতে লাগলাম, প্রমোশন অথবা বেতন বৃদ্ধি এমনই কিছু হবে হয়তো।

হুদা ভাই বললেন, সুখবরটা জানতে চাইলেন না?

আমি যেদিন থেকে আপনার এখানে এসেছি-সেদিন থেকে প্রতিদিনই আমি সুখবরের মধ্যে আছি। হুদা ভাই বললেন, না-না, অতোটা ভাবা ঠিক নয়। আমি কারো উচিত মূল্য দিতে পারলে ভাবি কিছু একটা করতে পারলাম। এতেই আমার তৃপ্তি।

সে আমি জানি।

আপনার 'জীবনযুদ্ধ' ছবির জন্য মনোনীত হয়েছে।

কথাটা শুনেই আমি সহসা কিছুই বলতে পারলাম না। তারপর চোখ দুটো ভিজে উঠলো। তবে মনের দৃষ্টিতে একটা আলোকময় পথ আমি দেখতে পেলাম। হুদা ভাই আমার চোখে পানি দেখে বললেন, সালু ভাই আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আপনি শান্ত হন। আপনার জন্য আরো অনেক কিছু করার ইচ্ছে আছে আমার। দু'এক দিনের মধ্যেই আপনাকে ডাকবে ওরা।

তারপর আরেক নতুন জীবন এলো আমার। ছুটোছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে কাটতে লাগলো প্রতিটি দিন। হাতে এলো অনেক টাকা। একদিন হঠাৎ করেই হুদা ভাইয়ের গাড়ি নিয়ে ছুটলাম গাবতলী কুদ্দুস নানার হোটেলে। শুনলাম কুদ্দুস নানা সেখান থেকে অনেক দিন আগেই চলে গেছে।

একটা বয়কে বললাম, তার ঠিকানা বলতে পারো?

সে বললো, মতিঝিল আছে।

শুধু মতিঝিল বললে তো তাকে পাওয়া যাবে না।

ভিতর থেকে একজন বয়সী লোক এসে বললো, কুদ্দুস উস্তাদ 'রজন' হোটেলে আছে।

আমি তখনই ছুটলাম। হোটেলের রিসিপশনে নানার নাম বলতেই একটি মেয়ে বললো, আপনি এখানে বসুন আমি খবর পাঠাচ্ছি।

দশ মিনিটের মধ্যেই নানা এলো। অনেক দিন পর দু'জন দু'জনকে দেখে কিছু না বলে দু'জনেই তাকিয়ে আছি। নানা এবং নাতি দু'জনেরই আমূল পরিবর্তন। শেষে আমিই বললাম, কেমন আছো বলে আর সময় নষ্ট করবো না। ড্রেস পাল্টে এসো।

নানা বললো, এতো দিন পর এই তোমার আসার সময় হলো?

হ্যাঁ-সময় পেয়েই আমি ছুটে এসেছি।

ঠিকানা পেলে কোথায়?

সেই হোটেলে।

কিন্তু এখন তো আমার সময় হবে না।

হবে। গাড়ি করে একটু ঘুরবো দু'জন। তারপর– আবার তোমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে আমি যাবো পুরান ঢাকা।

গাড়ি কি তোমার?

না-হুদা ভাইয়ের। সে অনেক কথা। যেতে যেতে বলবো।

অবস্থা বুঝে হোটেলের ম্যানেজারকে সব খুলে বললাম। ম্যানেজার হেসে বললেন, তা যখন নানা-নাতির ব্যাপার তখন আর কী বলবো আমি।

পথে বেরিয়ে বড় একটা হোটেলে ঢুকে–দু'জন ইচ্ছা মত খেয়ে নিলাম। এলিফ্যান্ট

রোডে এসে কিছু কেনাকাটা করলাম। কুদ্দুস নানা বললো, এর মধ্যে কি আর বাড়িতে গিয়েছিলে?

না।

আর কতকাল দেশান্তরি হয়ে থাকবা-এবার যাও।

আর একটু দেরি হবে।

সেদিনের মতো ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম, এখন একবার মহব্বত স্যারের বাড়িতে আমার যাওয়া উচিত। মহব্বত স্যার আর যাই করুক, পথের মানুষের জন্য তার যে বিশাল হৃদয়, তার তুলনা হয় না। ভাবী আর নয়নের কথাও খুব মনে হতে লাগলো।

হলো না। এর মধ্যেই অনেক দায়িত্ব এসে মাথায় চাপলো। তা ছাড়া নানান কাজে কেবল ছুটোছুটি। হঠাৎ একদিন স্যারের অফিসের পাশ দিয়ে যেতেই মনে হলো সুযোগটা হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না। দেখাটা করেই যাই।

ভিতরে ঢুকে সালাম দিতেই স্যার বললেন, আরে সালু ভাই, কেমন আছেন?

ভালো। স্যার, ভাবী আর নয়ন কেমন আছে?

এই তো-গরিবের দিন কেটে যাচ্ছে এক রকম।

আমি মহব্বত স্যারের হাতে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে বললাম, স্যার নয়নকে কিছু কিনে দিবেন। দেশান্তরি হওয়ার পর নয়নকে পেয়ে আমি অনেক কিছুই ভুলেছিলাম।

স্যার টাকা পেয়ে গদগদ হলেন না। কারণ, সে আরো কিছু চায়। তবু বললেন, সালু ভাই ঠিক সময় এসেছেন। বড় অভাবের মধ্যে দিন যাচ্ছিলো। আপনার টাকাটা আমি অবশ্যই ফেরত দিয়ে দেবো। তবে কয়েকটা দিন দেরি হবে।

টাকা আপনাকে ফেরত দিতে হবে না।

তাই কি হয়!

আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন।

আরে ভাই-এই মহব্বতজান-মানুষের জন্য কিইবা এমন করতে পারলো।

ঠিক চলে আসার সময় স্যার বললেন, সালু ভাই প্রফেসর সাহেবের সাথে আপনার যোগাযোগ আছে?

অনেক দিন দেখা হয় না।

বেটাতো বিয়ে করেছে।

বেশতো। প্রফেসর সাহেবের টাকা-পয়সা আছে, বয়সও হয়েছে, নিজে রান্না করে খান। বিয়েটা আগেই হওয়া উচিত ছিলো। কথাটা বলেই আমি আর দেরি করলাম না।

ছবির শুটিং চলছিলো। হঠাৎ একদিন পরিচালক ডেকে পাঠালেন। তখনই ছুটলাম স্টুডিওতে। সেখানে প্রযোজক সাহেবও আছেন। পরিচালক বললেন, সালু ভাই এই দৃশ্যটা একটু পাল্টাতে হবে।

কেনো?

নায়ককে যে আপনি সদর দরজা দিয়ে নায়িকার বড়লোক পিতাকে জব্দ করতে পাঠালেন- এটা কি ঠিক হলো? কেমন যেনো গুণ্ডা গুণ্ডা ভাব। এমন হলে নায়িকার

ভালোবাসা কি থাকবে?

থাকবে না কেনো? ভালোবাসা আরো গাঢ় হবে। নায়িকাতো নায়কের আদর্শ দেখেই তাকে ভালোবেসেছে। আর পোশাকের মধ্যে গুণ্ডা গুণ্ডা ভাব না থাকলেই হবে।

এসব আগের দিনের কিচ্ছা। এখন ওসব চলে না। এখন মেয়েরা বাবার বিরুদ্ধে যায় না। আরে টাকা থাকলে ভালো ছেলে গণ্ডা গণ্ডা পাওয়া যায়।

আমাকে এখন কী করতে হবে।

নায়ক মুখোশ পরে স্পাইডারের মতো বাড়ির পেছনের দেয়াল বেয়ে দশ তলায় নায়িকার ফ্ল্যাটে ঢুকে যাবে। নায়িকা ক্রিকেটের ব্যাট দ্বারা আঘাত করবে নায়কের মাথায়। নায়ক অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তখন নায়কের মুখোশটাও খুলে পড়বে। নায়িকা হায় হায় করে উঠবে। চিৎকার শুনে বাবা বন্দুক হাতে ছুটে আসবেন।

কী হয়েছে রে মা।

কিচ্ছু না বাবা।

চিৎকার করলি কেনো?

স্বপ্ন দেখে।

কোনো খারাপ স্বপ্ন?

দেখলাম- তুমি ছাদ থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছো।

বাবা হেসে বললেন, পাগলি আর কাকে বলে।

বুঝলেন সালু ভাই- সম্পূর্ণ নতুন এক ক্লাইমেক্স। আরে দর্শক তো এমন কিছুই চায়। কিছু বুঝলেন?

কিন্তু নায়িকা ঐ রাতে ব্যাট পাবে কোথায়?

প্রযোজক বললেন, সালু ভাই আপনার কাহিনী ভালো। তবে একটু মাথা খাটাতে হবে। এখনকার মেয়েরা খেলা দেখেই না- নিজেরাও খেলে। এক ফাঁকে নায়িকার হাতে একটা ব্যাট দেখিয়ে দিলেই হলো। তা না হলে একটা ক্রিকেট খেলার দৃশ্য লিখে ফেলুন। খেলার মাঝখানে ভিলেন এসে ঝামেলা করবে। হঠাৎ নায়কের আবির্ভাব। চোখের পলকে নায়ক ব্রুসলির মতো দু'একটা ফ্লাইং কিক দিতেই ভিলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ে পালাবে।

পরিচালক আর প্রযোজকের কথা শুনে আমার মাথার মধ্যে চক্কর দিয়ে উঠলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো-ব্রুসলির বিড়াল মার্কা শরীরের তির-ধনুক আক্রমণ। তবু ধীরস্থির হয়ে বললাম, তাতে যে জীবনযুদ্ধের আদর্শই ভেঙে পড়বে।

পরিচালক বললেন, আপনি স্ক্রিপটা নিয়ে আর একটু ভাবুন। এটুকু হলেই দু'সপ্তাহের মধ্যে শুটিং এর কাজ শেষ করা যাবে।

অফিসে মন বসলো না। বাসায় এসে গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলাম। হুদা ভাই বললেন, কী ব্যাপার? কোনো সমস্যা? হুদা ভাইকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, ওরা যা চায় তাই করে দেন। ওরা জানে পাবলিক কী খায় আর কী খায় না।

তাই বলে...।

আগে দাঁড়াবার জায়গা করেন রে ভাই। তারপর বসা- তারপর শোয়া। তারপর

গড়াগড়ি- বুঝলেন কিছু?

কিছু কিছু।

দেখতে দেখতে এসে গেলো ঈদ। কিছু কেনাকাটার জন্য বসুন্ধরায় গেলাম। তবে আমার জন্য নয়, হুদা ভাইয়ের বাচ্চাদের জন্য।

বাড়িতে যাবো বলে মনঃস্থির করলাম। তবে কোরবানির ঈদের পর। 'জীবনযুদ্ধের' প্রদর্শনী শুরু হলে।

দেখতে দেখতে এসে গেলো ঈদ। কিছু কেনাকাটার জন্য নিউ মার্কেটে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে একটা ছোট ছেলেকে দেখে চেনা চেনা মনে হতে লাগলো। আস্তে আস্তে গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। বললাম, তুমি কে? তোমার আব্বুর নাম কী?

আমার চোখে তখন সানগ্লাস। ঢিলাঢালা কোর্ট প্যান্ট। ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়েই চিৎকার শুরু করলো।

আতিয়ার আব্বা- ছেলে ধরা আমায় ধরে নিয়ে গেলো।

আতিয়ার মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে বললো, আরে সালু কেমন আছিস?

ভালো। তাই তো বলি এই দুষ্টুটাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। তা আতিয়ার আব্বা বলার অর্থ কী?

অর্থ এই যে, ভিড়ের মধ্যে অনেক ছেলেমেয়েরাই বাবাকে না দেখতে পেয়ে আব্বা, আব্বু করতে থাকে। তো বাবারা কি করে বুঝবে যে তার ছেলেই তাকে ডাকছে। কোথাও যাবো বললে, পাছ ছাড়ে না। নিয়ে গেলে স্থিরও থাকে না। তাই এই ব্যবস্থা।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, যেমন বাবা- তেমন তার পুত্র। তো বাচ্চার জন্য কী কিনলি?

কিনবো।

তখন আমি একটা সেট দেখে আতিয়ারকে বললাম, দেখতো এটা কেমন হয়। ও বললো, তুই রাখ আমি দেখছি। আমি সেট-টা প্যাকেট করায়ে দোকানিকে টাকা দিয়ে দিলাম। আতিয়ার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আজ তোকে অন্যরকম লাগছে।

কী রকম?

মনে হচ্ছে- ফাগুন তব দুয়ারে, শরাব পিয়ালা হাতে প্রতীক্ষায় সাকান।

বাঃ কথাটাতো চমৎকার।

বিয়ে করেছিস?

না।

এখন কী করছিস?

করছি একটা কিছু। তোর একটা কার্ড দেতো। ক'দিন পর একটা খবর দিবো তোকে।

তাহলে বিয়ে কি ঠিকঠাক।

আরে ওসব কিছু না। এখন আর ওসব চিন্তা মাথায় নেই।

আতিয়ার আর কিছু না বলে একটা কার্ড আমার হাতে দিয়ে বললো, ঈদের দিন বাসায় আয়। আমি বললাম, ঐ দিন প্রযোজকের বাসায় না গেলেই নয়।

প্রযোজকের বাসায় কেনো?

কথাটা তোকে বলেই ফেলি। ঈদের দিন আমার 'জীবনযুদ্ধ' রিলিজ পাচ্ছে। সময় পেলে বইটা দেখিস।

তোর বই মানে তোর লেখা বই?

হ্যাঁ।

মধুমিতা হলে হুদা ভাইসহ আমরা কয়েকজন বসেছি। কুদ্দুস নানাও আছে আমাদের সাথে। হাউজফুল। এক সময় ছবি শুরু হলো। হলে 'টুঁ' শব্দটি নেই। পরিচালক প্রযোজক ছুটে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন সিনেমা হলে।

ছবি শেষ হওয়ার পর আমরা বেরিয়ে আসছি। নানান জনের নানান অভিমত। কেউ বলছে, কাহিনীর সাথে সার্থক নাম হয়েছে- 'জীবনযুদ্ধ'। কেউ বলছে, বইটা সত্যি 'জীবনযুদ্ধ'। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রক্ত কেমন টগবগিয়ে ওঠে। গেটের কাছে আসতেই ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি। কতকগুলো তরুণ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কিছু মনে করবেন না ভাই। এখন রক্ত বড় গরম। কুদ্দুস নানা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমি নানাকে বললাম, খবরদার এ সময় কিছু বলতে যেয়ো না। ওরাই তো জীবনযুদ্ধের নায়ক-নায়িকা।

দেশান্তরি হওয়ার প্রায় দশ বছর পর মনটা কেনো জানি বাড়ি যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে পড়লো। ফেলে আসা কতো স্মৃতি জেগে উঠলো মনের মধ্যে। খুব ছোটবেলার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ায় মনে মনে হাসলাম আমি। একথাও ভাবি যে, সেই ঘটনার সাথে জীবনের কোনো দৃশ্য খুঁজে পেলাম না।

মিয়া বাড়ির বড় মিয়া, নাম সারাফাত মিয়া। তখনকার ডাকসাইটে চেয়ারম্যান। চৈত্রের এক দুপুরে, তিনি পাড়ার লোকদের সঙ্গে আমতলায় হাওয়া খেতে বসেছেন। আমি তখন স্কুলে যাই কি না যাই- ঠিক মনে নেই। তবে একথা মনে আছে যে, আমি ঘুরতে ঘুরতে চেয়ারম্যান সাহেবের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আর আমার হাতটা আস্তে আস্তে চেয়ারম্যান সাহেবের লোমওয়ালা একটি কানের লতি ধরে ফেললো। তিনি নীরবে গরম চোখে তাকালেন আমার দিকে। আমি কান ছেড়ে দিলাম। আবার ধরলাম। এভাবেই চলতে থাকলো। চেয়ারম্যান সাহেব না পারছেন কিছু বলতে না পারছেন উঠে যেতে। শেষে ছেলেরা আমতলায় ফুটবল নিয়ে আসতেই আমি দৌড়ে চলে গেলাম সেখানে। স্কুলে পড়ার সময়ও ভেবেছি অতটুকু বয়সে চেয়ারম্যানের কান ধরেছি, বড়

হয়ে কার কান ধরবো তা শুধু আল্লাহই জানে।

যাহোক, বাড়ি ফেরার কথাটা টেলিফোনে কুদ্দুস নানাকে জানাতেই নানা যেনো খুশিতে নেচে উঠলো। বললো, কবে যেতে চাও বলো। আমাকে তো সেভাবেই ছুটি নিতে হবে। আমি বললাম, আজ রবিবার। আসছে রবিবারে আমরা রওনা হবো। তারপর শুক্রবার ফিরে আসবো ঢাকা।

কথা এক রকম পাকাই হয়ে গেলো। বাড়ি যাওয়ার আগে একবার স্যারের বাড়িতে যাওয়ার কথাও মনে হলো আমার। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সময় বের করতে পারলাম না। একদিন বিশেষ একটা কাজে কমলাপুর স্টেশন থেকে ফেরার পথে কাকরাইল এসে ভাবলাম, এখনই একটু ঘুরে যাই। তা না হলে আর সময় হবে না। তখন রাত প্রায় দশটা। গলির মোড় থেকে এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে সেই বকুলতলা গিয়ে দাঁড়িয়ে নয়নকে ডাকলাম।

কোনো সাড়া মিললো না। একটু পরই দরজা খুললেন ভাবী। বললেন, সালু ভাই আসেন। ভাবীর মনটা কেমন বিষণ্ন। এতো দিন পর বাসায় গেলাম, কোথায় হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে, অথচ ঠিক তার উল্টো দৃশ্য। যেনো মৃত বাড়ির শোকসন্তপ্ত এক পরিবার।

ভাবী, নয়ন কি ঘুমিয়েছে?

না।

স্যার কি বাসায় নেই?

না।

কোথায়?

বসেন বলছি।

হঠাৎ লক্ষ করলাম ভাবী যেনো খুব সাবধানে চোখের পানি মুছলেন আঁচলে। আমি তখন নয়নকে ডাকলাম। অন্য ঘর থেকে নয়ন এসে আমার পাশে বসলো।

কী হয়েছে নয়ন?

নয়ন সে কথার উত্তর না দিয়ে– আমাকে জড়িয়ে ধরে চাচা বলে কেঁদে উঠলো। আমি চমকে উঠলাম। নিশ্চয়ই স্যারের কিছু হয়েছে। কালীগঞ্জের সেই চোখ টেরা লোকটা কি তাহলে স্যারকে খুন করেছে! কিন্তু আলোচিত এই মহব্বতজানের মৃত্যু সংবাদ কখনো চাপা থাকতে পারে না। নাকি ভাবীর সাথে রাগারাগি করে আমার মতো শহরান্তরি হয়েছে। শেষে ভাবীকে বললাম, ভাবী, কী হয়েছে খুলে বলুন তো।

ভাবী বললেন, ডা: সামাদ আদালতে তার নামে কেস করেছিলেন। নোটিশ পেয়ে আদালতে হাজির হতেই তাকে অ্যারেস্ট করে জেলে পাঠিয়েছে।

কবেকার ঘটনা।

আজ তিন দিন।

আপনারা জামিনের চেষ্টা করেননি?

নয়নের চাচা উকিল নিয়ে জামিনের চেষ্টা করেছে– কিন্তু লাভ হয়নি।

কেসটা কী?

সে নাকি ডা: সামাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছিলো। সেই টাকা

সময় মতো ফেরত দেয়নি বলেই এই অবস্থা। টাকা পয়সা নেয়ার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। আজ তিন দিন কী অবস্থায় যে আমাদের দিন যাচ্ছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। নয়ন তো খাওয়া দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে।

বলতে বলতে ভাবী কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, ভাবী শান্ত হন। আপনারা আমাকে একটা খবর পাঠাতে পারতেন।

কে কী করবে। মানুষটাকে কতবার বলেছি তোমার স্বভাবটা এবার পাল্টাও। দান খয়রাত করতে চাও নিজের পয়সায় করো। পরের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে- এ সব আমার ভালো লাগে না।

আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। পরদিন সকালে হুদা ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ডা: সামাদ সাহেবের বাসায়। সামাদ সাহেব বর্ণনা করলেন পুরা ঘটনাটা। সেই কবে সামাদ সাহেব বিদেশ থেকে ফিরে এলেন- স্যারের বাসাতেও কিছুদিন থাকলেন। তারপর তিনি চলে যাওয়ার পর একদিন সুযোগ বুঝে- স্যার সামাদ সাহেবের কাছ থেকে নিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।

সে যাই হোক– আমি এবং হুদা ভাই কেসটা তুলে নেয়ার জন্য সামাদ সাহেবকে বোঝাতে লাগলাম। কিন্তু সামাদ সাহেব- টাকা ছাড়া কিছুতেই কেস তুলতে রাজি নন।

বিকালে ভাবী আর নয়নকে নিয়ে আবার গেলাম ডা: সামাদের বাসায়। এই ডা: সামাদ ভাবীর হাতে কতো খেয়েছে। অথচ আজ... । সেই দুঃখ করেই সামাদ সাহেব বললেন, ভাবী এমন একটা ঘটনা ঘটবে তা আমিও চাইনি। মহব্বত সাহেব টাকা তো দেনই না– তার ওপর সে উল্টা আমাকেই ভয় দেখায়। এখন বিচারে যা হয় হবে। তবে কেস আমি ডিসমিস করতে পারি, তার আগে আমাকে আমার পাওনা টাকা দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই মেনে নিলাম তার কথা।

পরদিন কোর্টে হাজির হলাম। এগারোটার মধ্যে এই কেস থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন স্যার। হুদা ভাইয়ের গাড়িতে আমরা রওনা হলাম বাসার দিকে। স্যার বুক ফুলিয়ে বলতে লাগলেন, কোনো শালার বেটার ক্ষমতা নেই যে, আমাকে আটকে রাখে। ডা: সামাদের মতো কতো সামাদের পেটে আমার বাড়ির ডাল-চাল আছে। সব শালা ভণ্ড, নিমকহারাম। পারলি এই মহব্বতজানকে আটকে রাখতে।

কিন্তু কী করে যে এই জালিয়াতির কেস থেকে স্যার মুক্তি পেলেন, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। জানতেও চাইলেন না। শুধু ভাবী জানেন কেমন করে কিভাবে কেসটা ডিসমিস করা হলো। আর সেই টাকাটাই বা জোগাড় হলো কিভাবে।

রবিবার সকালে– কুদ্দুস নানার ফোন এলো। সে বললো, নানা আমি কি তোমার বাসায় আসবো, না তুমিই আসবা আমার এখানে। সকাল সকাল যেতে পারলে ভালো হয়।

আমি বললাম, নানা এখন তো আমি বাড়ি যেতে পারছি না। তুমি যেতে চাইলে একাই চলে যাও। আমি আজ জীবনযুদ্ধে জিতে গেছি। আমি তিনটি মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে।

[সমাপ্ত]

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশাল মূল্য ছাড়

আপনি কী? আপনার ছেলেমেয়েদেরকে স্বর্ণযুগের সোনালী মানুষ (সাহাবী, তাবীঈ, তাবে তাবীঈর) মতো গড়তে চান তাহলে তাদের নিয়ে গল্প আকারে রচিত বইগুলো সংগ্রহ করুন।

শিশুতোষ বই ৩৫টি (১সেট) ৫০৪০ টাকা কমিশন ২৪৫০ টাকা

১. যে অতীত প্রেরণা যোগায়-১ম ২য় গল্প। ২. ছোটদের বিশ্বনবী (স.)। ৩. ন্যায় বিচারের গল্প। ৪. পেতাম যদি এমন শাসক। গল্প ৫. শিশুতোষ পাঁচ পয়গম্বর- জীবনী। ৬. শিশুতোষ বাদশা সোলায়মান ৭. ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে-জীবনী। ৮. ছোটদের হাসানুল বান্না। ৯. কুরআনের গল্প। ১০. হাদীসের গল্প। ১১. ছোটদের শেখ শাদী। ১২. মেধা বিকাশের সোপান। ১৩. কিতাবুস সালাত। ১৪. এসো কুরআন শিখি। ১৫. এসো হাদিস শিখি। ১৬. আবু বক্কর (রা.)। ১৭. ওমর (রা.)। ১৮. ওসমান (রা.)। ১৯. আলী (রা.)। ২০. খাদিজা (রা.)। ২১. আয়েশা (রা.)। ২২. ফাতেমা (রা.)। ২৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ২৪. আশারায়ে মুবাশ্‌শারা (রা.)। ২৫. আনাস ইবনে মালেক (রা.)। ২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। ২৭. আবু হোরায়রা (রা) ২৮. সালমান ফারসি (রা) ২৯. হাসান হোসাইন (রা) ৩০. সেরা মুসলিম বিজ্ঞানী। ৩১. সেরা মুসলিম মনীষী। ৩২.ওমর ইবনে আবদুল আজীজ। ৩৩. নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। ৩৪. ভাল মানুষের গল্প।

৩৭টি বই (১সেট) ৬৫৬০ টাকা কমিশন বাদে ৩২০০ টাকা

১. আসান ফিকাহ-১ম ও ২য় খন্ড। ২. এন্তেখাবে হাদীস-(১, ২) একত্রে। ৩. রাহে আমল-১ম ও ২য় খন্ড। ৪. যাদে রাহ্। ৫. ফিকাহ মুহাম্মদী। ৬. মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার। ৭. কবীরা গুনাহ। ৮. গীবত বা পরনিন্দা। ৯. সকাল সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ আমল। ১০. কোরআন তিলাওয়াতের ফজিলত। ১১. পর্দা কি কেন পর্দা কর না? ১২. মহিলা সাহাবী। ১৩. পয়গামে মুহাম্মদী। ১৪. কেয়ামতের বিভীষিকা-১-২। ১৫. বোখারা সমরকন্দের করুণ ইতিহাস। ১৬. রিয়াদুস ছালেহীন (১-৪)। ১৭. আদাবে জিন্দেগী। ১৮. ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ। ১৯. ইসলামী আন্দোলনের কৌশল ও কর্মসূচি। ২০. ইসলামে সামাজিক বিধান। ২১. রাসূল্লাহর নামায। ২২. বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান। ২৩. জীবন সায়াহ্নে মানবতার রুপ। ২৪. আল কোরআনের বিষয় অভিধান। ২৫. রাসূলুল্লার (স.) বিপ্লবী জীবন। ২৬. আখিরাতের চিত্র। ২৭. জান্নাত লাভের উপায়। ২৮. আল্লাহর পথে ব্যায়। ২৯. আমরা দাওয়াতি কাজ কীভাবে করবো? ৩০. কুরআন হাদীস সংকলন। ৩১. আল্লাহর রাসূল যে সব দু'আ ও জিকির পড়তেন।

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) লিখিত দারসে কুরআন সিরিজের ১-৫৬টি বই ১৫০০ টাকা

নসীম হিজাযীও শফীউদ্দীন সরদার (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ২০টি বই কমিশন বাদে ২৭০০ টাকা

১. সীমান্ত ঈগল। ২. মহাবীর সুলতান মাহমুদ। ৩. কায়সার কিসরা। ৪. আধার রাতের মুসাফির। ৫. শেষ বিকালের কান্না। ৬. ইউসুফ বিন তাসফীন। ৭. হেজাযের কাফেলা। ৮. কিংসায়মনের রাজত্ব। ৯. ইরান তুরান কাবার পথে। ১০. ভারত যখন ভাঙ্গল। ১১. অপরাজিত। ১২. মানুষ ও দেবতা। ১৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসীম। ১৪. মরণ জয়ী। ১৫. ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার। ১৬. খুনরাঙ্গা পথ। ১৭. শেষ প্রান্তর। ১৮. পথহারা পাখী। ১৯ . অপূর্ব অপেরা। ২০. এক পাহাড়ী সন্তন।

গাজী সালাহউদ্দীন আয়ূবীর দুঃসাহসী অভিযান নিয়ে রচিত ক্রুসেড সমগ্র (১,২,৩)

ক্রুসেড সমগ্র-১
মূল্য : ৮০০ টাকা
৫৫% কমিশন
মূল্য : ৩৬০ টাকা

ক্রুসেড সমগ্র-২
মূল্য : ৮০০ টাকা
৫৫% কমিশন
মূল্য : ৩৬০ টাকা

ক্রুসেড সমগ্র-৩
মূল্য : ৮০০ টাকা
৫৫% কমিশন
মূল্য : ৩৬০ টাকা

এছাড়া তাফসীর ইবনে কাসির-১-১৮/। শব্দে শব্দে কোরআন, ফি-যিলালিল কুরআন ১-২২। সহীহুল বোখারী-১-৬। এবং নতুন সিলেবাসের কর্মী , সাথী , সদস্য, স্কুল, রোকন স্বল্প ও উচ্চ শিক্ষিত সকল বই পেতে যোগাযোগ করুন।

ইসলামী ব্যাংক
সদর ঘাট শাখা।
চলতি হিসাব-৪৯৯৭৫

তাক্বিয়া বুক ডিপো

প্রকাশনায় ও পরিবেশনায়

তাক্বিয়া বুক ডিপো

পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।
বিকাশ ঃ ০১৭৯১-৭৪৮৮৬৬, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

ডাক ও কুরিয়ারে সার্চিলে বই পাঠানো হয়।

বৈশাখ

লতিফা আজাদ পুষ্প

এলো এলো বৈশাখের দিন
চারপাশ হলো যে রঙিন!

পাগল করা ফলের ঘ্রাণে
জাগায় সাড়া মনে-প্রাণে।

বৈশাখের ঘন নীল আকাশে
পেঁজা তুলোর মেঘটা হাসে।

কখনো রোদের অসহ্য তাপ
দুপুরে ছোটে গরম ভাপ।

ঝড়ের দাপটে ভাঙে গাছের ডাল
কখনওবা উড়ে যায় ঘরের চাল।

কাঁচা পাকা আম-জাম -লিচু কুড়াতে
ছোটরা ছুটে যায় মন জুড়াতে।

বৈশাখে ঝরে যায় পুরাতন পাতা
দোকানে দোকানে বসে হালখাতা।

বৈশাখ সাথে আনে নতুনের দিন
পুরনো স্মৃতি তবু হয় না বিলীন।

বৈশাখী ঝড়

আয়িশা জান্নাত আনিসা

বৈশাখ মাসে আসে কালবৈশাখী ঝড়,
ধরণীটা আছড়ে ওঠে কাঁপে থর থর।
গাছপালা ঘর-বাড়ি ভেঙে ফেলে যায়,
গরিবের জীর্ণ কুটির বাদ পড়ে না হায়!

মা পাখিটি ছানার খোঁজে ছোটাছুটি করে
ভেঙে যায় তার ছোট্ট নীড় সর্বনাশা ঝড়ে।
গৃহহারা হয় যে মানুষ, সবকিছু হারায়
এমনি করে কালবৈশাখী সবাইকে কাঁদায়।

শ ব্দ ধাঁ ধা

এপ্রিল ২০২০ সংখ্যার শব্দধাঁধা

১			২		৩
		৪			
৫	৬				
			৭		৮
৯					
		১০			
১১					

পাশাপাশি: ১. তুফান, ঝঞ্ঝা ৩. শরীরের একটা অঙ্গ ৪. একটি বাংলা মাসের নাম ৫. লেখার উপকরণ ৭. স্পেনের আন্দালুসিয়া প্রদেশের রাজধানী ৯. গ্রন্থ, পুস্তক ১১. মুসলমানের ধর্ম।

উপর-নিচ: ১. দীপ্তি, দ্যুতি ২. গণিতে ফল নির্ণয় করা ৪. ফলের রাজা ৬. সংগ্রাম, যুদ্ধ ৭. পল্লী, পাড়াগাঁ, ছোট লোকবসতি ৮. গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খলা ৯. একটি ফল বিশেষ ১০. যাত্রা করা, অগ্রসর হওয়া।

জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতা

ঢাকা: জাইমা বিনতে আশিফ, নাফিস ফুয়াদ, মুগদা; উনাইসা, ধানমন্ডি; শাহিন পাঠান, যাত্রাবাড়ী; মিরাজ উদ্দিন আহমেদ, সবুজবাগ; মাইনুল হাসান, নবিলা তাসনিম, ডেমরা; জুহাইর তানজিম, লালবাগ; ইসরাত জাহান রুমি, আশুলিয়া; শার্মিলা আক্তার, শাহজাহানপুর; ঐ।

ময়মনসিংহ: মো: তাওহিদুল ইসলাম রাজিন, সদর; মোঃ রিপন মিয়া, আশরাফুল ইসলাম ফরহাদ, সাদিয়া ইসলাম সূচনা, সাদিয়া আক্তার রিয়া, শায়লা আক্তার মোহনা, মিফতাহুল জান্নাত রাইসা, ইসরাত জাহান লিয়া, মেহেদী হাসান অপু, সালমান হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; ঐ।

বাগেরহাট: নাইম আহমেদ ফারদিন, লিজা আক্তার, কারিমা আক্তার, আব্দুল্লাহ আল জাবির বিন নাসির, বনি আমিন, তাওহিদুল ইসলাম, জান্নাত তুবা, আয়েশা সিদ্দিকা, নাফিসা বিনতে নাসির, হাসিবুর রহমান, মোসাদ্দেক হাবিব রাফিদ, মোরেলগঞ্জ; মো: আল-আমিন শেখ, মংলা; মোতাছিম বিল্লাহ, তরিকুল ইসলাম, মো: জাবেদ আলী, কালিপুর, তরিকুল ইসলাম, মো: গোলাম মাকসুদ, মো: কাউছার, মোঃ ইমরুল হাসান রিফাত, মো: আলী আকবর, মজিব শেখ, সজিব হোসেন হৃদয়, সালমান খান, মো: লিমন মোল্লা, কচুয়া; ঐ।

পঞ্চগড়: আবির হাসান জীবন, মোঃ মাহবুবুল হাসান রনি, রুবেল ইসলাম, তেঁতুলিয়া; সোহেল রানা, পারভেজ ইসলাম, মো: আলীউল ইসলাম, বোদা; হোসাইন রাসেল, দেবীগঞ্জ, ঐ।

ফরিদপুর: রাবিয়া শরীফ, মধুখালী; মাশরুর হোসেন, আফসানা ইয়াসমিন, মহাদি হাসান রাতুল, খাইরুল্লাহ, আরাফাত হোসাইন, হাফেজ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সুরাইয়া ইসলাম, বোয়ালমারী; ঐ।

জামালপুর: মো: আরিফুর রহমান, জাকিয়া ফারজানা, ফারিহা জান্নাত

তাহিয়া, জান্নাতুল মাওয়া, নাজমুস সাকিব, মশিউল আলম লিখন, নাজমুল হক, সোহাগ হোসেন, দেওয়ানগঞ্জ; ঐ ।

দিনাজপুর: মো: সাবির হোসেন সিয়াম, জিহাদ সরকার আপন, শাহেদ মোস্তফা সাহেদ, আবির শেখ পৃথিবী, জাইবিন রহমান জিয়ন, বিরামপুর; ঐ ।

কুমিল্লা: হাসিবুল ইসলাম, বরুড়া; মাহমুদুল হাসান নাসিম, মো: আব্দুল্লাহ, হাবিবুর রহমান মিয়াজী, বোরহান উদ্দিন মজুমদার, পারভেজ হোসেন, ইখতিয়ার উদ্দিন মজুমদার, রাশেদুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসেন শাকিল, হাসিবুল হাসান নাঈম, আব্দুল কাদের, সাকিব হোসেন, সামিউল ইবনে শাহাদাত, নাজমুল ইসলাম রাহাদ, সুলতান সালাউদ্দিন, জুবায়ের হোসেন, জাহিদ হাসান, আনোয়ার হোসেন, চৌদ্দগ্রাম; ফাতেমা তুজ সাদিয়া মাওলা, লাকসাম; ঐ ।

সাতক্ষীরা: হুমাইরা হেমা, ফিরোজ শেখ, ফাইয়াজ সাফওয়াত, সুমাইয়া আফরিন, জে এম তাসনিম রুবাইয়াত, খালেদ সাইফুল্লাহ সাঈদী, তালা; হাফেজ মো: আব্দুস সালাম, আশাশুনি; তাবাসসুম আফরিন তাইমা, শ্যামনগর; ঐ ।

নোয়াখালী: মেহেদি হাসান হৃদয়, মাইজদী; আমির হোসেন রিয়াদ, আব্দুর রহমান রাকিব, ইমরান হোসাইন, নাজমুল ইসলাম মুজাহিদ, কবিরহাট; উম্মে রুম্মান মাহি, মারিয়া আক্তার মারিয়া, চাটখিল; সিনান বিন সাঈফ, সদর; ফাহমিদা আক্তার ইশাত, সোনাইমুড়ী; ঐ ।

চট্টগ্রাম: মোঃ মিসবাহ, পতেঙ্গা; নূর উদ্দিন চৌধুরী সাহেদ, মো: সাঈদ আল কাদের, পারভীন আক্তার চাঁদনী, জাহিদ হাসান, মুফাসসিল, তানভীর হোসেন, ফারজানা আক্তার, রাউজান; জান্নাতুন নূর রাইসা, বাকলিয়া; জান্নাতুল নাঈমা সামিয়া, আমিন উল্লাহ সাঈদী, ইমরান হোসাইন, জাহিদুল ইসলাম সাকিব, ডবলমুরিং; আনতারা ফাইরুজ তোহফা, আরিফা আক্তার নুরা, আনিসুর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন, আকবর শাহ; জিয়াউদ্দিন, আনোয়ারুল ইসলাম, সাইফুদ্দিন, মাহমুদুল ইসলাম জিহান, সাখাওয়াত হোসেন রিয়াদ, সাইফুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির রাসেল, সিয়াম উদ্দিন চৌধুরী, বাঁশখালী; উম্মে হাবিবা শাহীন, মোঃ রিপন আলি, ফটিকছড়ি; তাসফিয়া তাবাসসুম, সীতাকুন্ড; জান্নাতুল সুমাইয়া ইবনাত, চাঁদগাঁও; সাদিয়া বিনতে আলী, হালিশহর; ঐ ।

মৌলভীবাজার: ইমন আহমদ শান্ত, নিত্য জিৎ দেব নাথ, রাফায়েত আহনাফ রাদ, হাসান আহমদ, মো: মাহমুদ হাসান, বড়লেখা, শামিম আহমেদ, মুরশেদ আহমেদ, রাজনগর, মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ, হোসাইন মোহাম্মদ আলমগীর, শ্রীমঙ্গল; ঐ ।

নীলফামারী: মো: ইয়াসিন আরাফাত, সাব্বির রহমান, উম্মে সাদিয়া মনি, মাজিদুল ইসলাম, ডিমলা, ঐ ।

কক্সবাজার: এস এম আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ আল জুবাইয়র, আবু সাঈদ, মোঃ নাঈম, রাকিব তাসিন, মোর্তুজা আলী, সদর, টিপু সুলতান, পেকুয়া, ঐ ।

রাজবাড়ী: মো: শাহিন আলম, আমানত মিয়া, আবু সায়েম, হাসান রুহানি, সায়েম ফকির, আমির হামজা, পাংশা, ঐ ।

অন্যান্য জেলাসমূহ: কুলসুমা বেগম, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ; শরিফা খাতুন

ইতি, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; আরিফুল ইসলাম, ধামইরহাট, নওগাঁ; সুলতানা নাজনীন, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ; হাবিবুর রহমান, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; নাজমুশ শাবাব, চারঘাট, রাজশাহী; আমেনা ইয়াসমিন, বড়বাড়ী, লালমনিরহাট; এইচ এম ওবায়দুর রহমান, বদরগঞ্জ, আবু সায়েম মেজবাহ, কোতোয়ালি, রংপুর; আবুল হাসনাত নবীন, লামিসা মুন, বোরহানউদ্দিন, ভোলা; আব্দুল্লাহ আল আকিব, জাবের হোসেন নীরব, মাকসুদুল আলম, সদর, লক্ষ্মীপুর; আরিফুল ইসলাম, আব্দুল হাকিম, উল্লাপাড়া, কুরাইশ হোসেন, সদর, সিরাজগঞ্জ; মো: আতিক উল্লাহ, মো: রফিক মনোয়ার সাঈদী, সদর, মাহাদি হাসান মাহিদ, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

এ মাসের পুরস্কার পেলো যারা

১. জাইমা বিনতে আশিফ, মুগদা; ঢাকা
২. মো: তাওহীদুল ইসলাম রাজিন
সদর; ময়মনসিংহ
৩. নাইম আহমেদ ফারদিন
মোরেলগঞ্জ; বাগেরহাট

জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যার সমাধান

ক	ম	লা			আ	দি
ল		ল	তা		ই	
ম	শা			দা	ন	
	ণি		ন	দী		জ
রা	ত		ম্র		ব	ল
খা		ন		ভ	র	সা
ল	ক	ব			ফ	

ঈদ সংখ্যা!

বন্ধুরা, আগামী মে ২০২০ সংখ্যাই কিশোরকণ্ঠের **ঈদসংখ্যা**। প্রতিবারের মতো এবারও থাকছে সেরা লেখকদের সেরা লেখা, যা তোমার ঈদ আনন্দকে বাড়িয়ে দেবে বহুগুণে। খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদের মজার সব লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে ঈদসংখ্যাটি। বাদ যাবে না তোমরাও। তোমার কপির জন্য আগে থেকেই বলে রাখো এজেন্ট এবং বিক্রয় প্রতিনিধিকে।

– সম্পাদক

এজেন্টরা অতিরিক্ত কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সেবাই প্রথম...

তামান্না হজ্জ গ্রুপ

IATA

তামান্না ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস

TAMANNA INTERNATIONAL TOURS & TRAVELS

আল রফিক ওভারসীজ, লাইসেন্স নং-৫২৩ কক্সবাজার ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, লাইসেন্স নং-৭২৩

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলিতেছে....

যোগাযোগঃ ৫, ফেয়ার প্লাজা (৭ম তলা), মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
ফোনঃ ৯০১৩৬৬৩, ৯০১০৭৯৭, মোবাইলঃ ০১৭৭০৬২৪৫৫০-৪, ০০৯৬৬-৫৮৩৫৩৯৯০২ (মক্কা শরীফ)
Web: www.tamannaworldbd.com, E-mail: info@tamannaworldbd.com

তামান্না টয়েজ এন্ড ট্রেড লিঃ

তামান্না ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি পার্ক, ঢাকা

ঢাকা পার্ক অফিস ঃ
১০, গড়ান চটবাড়ী, বেড়ীবাঁধ রোড, (বোটানিক্যাল গার্ডেনের পশ্চিম পার্শ্বে), শাহ আলী
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। মোবাইল ঃ ০১৭৭০৬২৪৫৫৩, ০১৭৭০৬২৪৫৫৬-৭

তামান্না ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি পার্ক এন্ড পিকনিক কর্ণার, ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ পার্ক অফিস ঃ
আরাপপুর ক্যাডেট কলেজ রোড, চরমুরারীদহ, ঝিনাইদহ।
মোবাইল ঃ ০১৭৭০৬২৪৫৫৮,০১৭৭০৬২৪৫৫৫

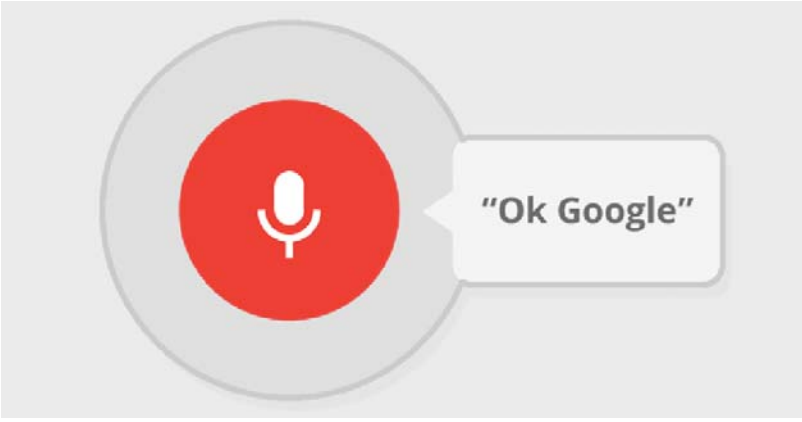

গুগল ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট পড়ে শোনাবে ওয়েবসাইট

শরীফ তাজওয়ার

প্রযুক্তি দুনিয়ার নিত্য নতুন আবিষ্কারে প্রতিনিয়তই আমরা চমকিত হচ্ছি। সহজ হচ্ছে আমাদের জীবনযাপন। কমে যাচ্ছে জটিলতা। এ যাত্রায় যারা দাপুটে অবদান রাখছে, তার মধ্যে গুগল অন্যতম। সম্প্রতি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টে দুর্দান্ত এক ফিচার যোগ হয়েছে। নতুন ফিচারে গোটা ওয়েবসাইট পড়ে শোনাবে গুগলের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট। স্মার্টফোন ব্রাউজারে যেকোন ওয়েবসাইট ওপেন করে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টকে পড়ে শোনানোর অনুরোধ করলেই সেই ওয়েবসাইট পড়ে শোনানো হবে। সুবিধাটি ব্যবহার করতে 'হে গুগল, রিড দিস' বা 'রিড দিস পেজ' নির্দেশ দিতে হবে। এরপর গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটি পড়া শুরু করবে। পর্দায় তখন পড়তে থাকা লেখাটি দেখাবে। একই সঙ্গে পড়ার গতি কমবেশিও করা যাবে। আপাতত শুধুমাত্র অ্যানড্রয়েড ফোনে এই ফিচার কাজ করবে।

ইংরেজি ছাড়াও বাংলা ও অন্যান্য ভাষার ওয়েবসাইটও পড়ে শোনাতে পারবে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট। গুগল জানিয়েছে ওয়েবসাইট পড়ে শোনানোর

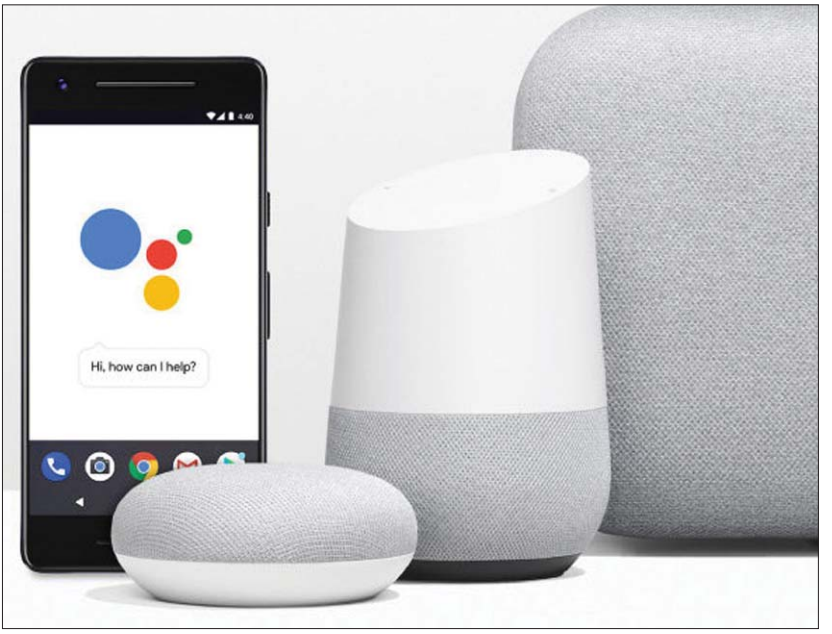

সময় রোবটের পরিবর্তে মানুষের মতো কণ্ঠস্বর অনুভব করবে গ্রাহকরা। গুগল জানিয়েছে আপাতত ৪২টি ভাষা পড়ে শোনাতে পারবে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

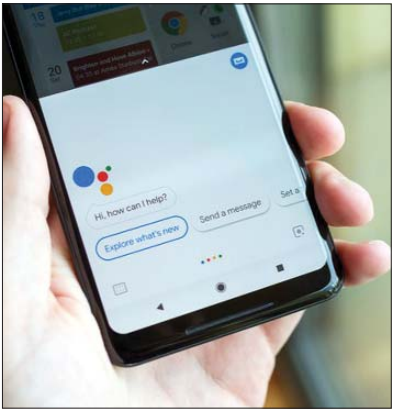

ট্রান্সলেশন থেকে চাইলে নিজের ভাষায় যে কোন ওয়েবসাইট শোনা যাবে।

গুগল জানিয়েছে এই রিডারের জন্য ওয়েব ডেভেলপারদের পৃথক কোন কাজ করতে হবে না। ব্লগ পোস্টে আরও জানানো হয়েছে গুগল ভাষার বাধা কাটিয়ে বিশ্বের বেশি মানুষের কাছে আরও বেশি তথ্য পৌঁছে দিতে চায়। এছাড়াও যে সব মানুষের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য এই ফিচার জ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। তাছাড়া অন্য কোনো কাজ করার সময় হয়তো অনলাইনে খবর পড়ে শোনাতে পারবে এটি। কিংবা রান্নার সময় রন্ধনপ্রণালি বা রেসিপি পড়েও শোনাতে পারবে। সবমিলিয়ে বলা যায়, অসাধারণ এক ফিচার হবে এটি।

শিকড় থেকে শিখরে

আমিনুল ইসলাম ফারুক

‘সফলতা’ শব্দের মানে কী? কখন একজন মানুষকে সফল বলা যায়? সফল হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় উপাদানগুলো কী কী? যার অনেক টাকা-পয়সা ও গাড়ি-বাড়ি আছে তিনিই কি সফল? যিনি অনেক অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন তাকেই সফল বলব? কিংবা সরকারের বড় কোনো চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাকেই সফল বলব? সাফল্যের আর কোন সীমা-পরিসীমা আছে কি? আসলে সফলতার নির্দিষ্ট কোনো ডেফিনেশন নেই। একজন মানুষ নিজেকে তখনই সফল ভাবেন যখন তার কাছে মনে হবে জীবনের কাছে যা তিনি চেয়েছেন, তা সবই পেয়েছেন। একজন মানুষের এই বোধ তৈরি হওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তবেই সাফল্য আসে। তার জন্য দরকার হয় সময় এবং সুযোগ। কিন্তু এই দুটো কখনো একসাথে আসে না বলেই বেশির ভাগ মানুষ জীবনে সফল হতে পারে না।

সাহিত্যে নোবেল লরিয়েট বব ডিলান পেশাদার সফল মানুষ চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন- 'A man is a success if he gets up in the mourning and gets to bed at night and in Between he does what he wants to do.' 'অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যিনি প্রত্যাশিত কাজগুলো ঠিকঠাক করতে পারেন তিনিই সফল মানুষ।'

সফলতার গোড়ার কথাই হলো কাজে লেগে যাও এবং এখনই লেগে যাও। জীবন ক্ষুদ্র এবং তা উপভোগের সময় আরো ক্ষুদ্র। মানুষের জন্ম নিয়তি নির্ধারিত আয়ু নিয়ে। জন্মের পর থেকে তাই তার বেঁচে থাকার বিয়োজন ঘটতে থাকে। এই অর্থে মানুষের আয়ু বাড়ে না বরং কমতে থাকে। তাই জীবনের চেয়েও সময়ের দাম বেশি। সবার আগে সময়ের সদ্ব্যবহার জরুরি। তোমার সমস্যা একান্তই তোমার। তার সমাধান তোমাকেই বের করতে জানতে হবে। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এতে কারো কিছুই যায় আসে না। ক্ষতিটা তোমারই। যে কোন খেলা খেলতে হলে আগে সে খেলার আইন-কানুন ভালোভাবে জেনে নিতে হয়। তবেই ভালোভাবে খেলা যাবে, আর তখন খেলা হবে উপভোগের এবং জেতার। বোকারাই শুধুমাত্র বসে থাকে এবং কারো মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হতে চায়। আর সাহসীরা উঠে দাঁড়ায় এবং কাজে লেগে যায়। নিজেকে শুধু চিনলেই হবে না, আবিষ্কার করতেও জানতে হবে। মনে রাখবে, নিজেকে আবিষ্কার করার মতো এত বড় আবিষ্কারক পৃথিবীতে আর নেই।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে জীবন হচ্ছে মাত্র দশ ভাগ। আর নব্বই ভাগই হচ্ছে জীবনকে আমরা কিভাবে দেখছি তার ওপর নির্ভরশীল। জীবন সহজ নয়, কঠিনও নয়, জীবন জীবনের মতো। আমরাই একে সহজ করি, জটিল করি। মানুষের জীবনকে ঢেউয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। প্রতিদিন একইভাবে জীবন চলবে না। একেক দিন একেক ধরনের ঢেউ আসবে। প্রতিনিয়ত

'অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যিনি প্রত্যাশিত কাজগুলো ঠিকঠাক করতে পারেন তিনিই সফল মানুষ।'

কোনো না কোনো বাধা তোমাকে কষ্ট দিবে, তোমার পথ থেকে সরে আসতে বলবে। তবে জীবন চলার পথে যা তোমাকে কষ্ট দেয় তা ভুলে যাওয়াই উত্তম। অথচ এ কষ্ট থেকে কী শিক্ষাগ্রহণ করেছো তা মনে রাখা চাই। তবেই জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র উপভোগগুলো স্মৃতিময় ও সুখকর মনে হবে। জীবনের কোনো ঘটনাই ক্ষুদ্র নয়, ভুলবার নয়, তুচ্ছ নয়। আলবার্ট আইনস্টাইন প্রায়শই বলতেন- 'জীবনটা সাইকেলের মতো। এ জীবনে ব্যালান্সের জন্য চাই তীব্র গতি। সাইকেলের প্যাডেল মারা বন্ধ করলেই যেমন আমরা পড়ে যাই তেমনি পরিশ্রম বাদ দিলেই জীবন ভেস্তে যায়।'

জীবনকে এক পেয়ালা চায়ের সাথে তুলনা করেছেন আল্লামা শেখ সা'দী। তিনি বলেন, 'জীবন হচ্ছে এক পেয়ালা চা। যতই তৃপ্তিসহকারে আমরা তা পান করি ততই দ্রুত তলার দিকে অগ্রসর হতে থাকি।'

থমাস জেফারসন বলেছেন- 'Three important parts of life are- Choice, Chances and Changes. You must make a choice to make a chance of your life untill never chnage.'

একজন মানুষ তখনই শক্তিশালী হয় যখন সে তার দুর্বলতা বুঝতে পারে। একজন মানুষ তখনই সাহসী হয় যখন সে বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে পারে। একটা স্বপ্ন কখনই বাস্তবে রূপ নেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি জেগে উঠবে। তোমাদের অনেকেই জেগে উঠতে ভয় পায়। যার ফলে তোমাদের স্বপ্নগুলোও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

তোমরা যারা ব্যর্থতাকে পাত্তা দাও না এবং নিজেদের ওপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী তারা আজ হোক কাল হোক সফল হবেই। সফল মানুষগুলো যে কোনো বিষয়কে খুব সহজভাবে নিয়ে থাকেন এবং সুযোগগুলোকে কাজে লাগান। ঠিক তোমাদেরও সুযোগ খুঁজতে হবে এবং সুযোগ পেয়েই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। একবার সুযোগ পেয়ে গেলে আর কালক্ষেপণ করা যাবে না, কারণ সুযোগ বেশিক্ষণ থাকে না। আবার এটাও ঠিক শুধু সুযোগের জন্য বোকারাই বসে থাকে। তোমার সারাজীবনে হয়তো কোনো সুযোগ নাও আসতে পারে তাই বলে তোমার কাজ বন্ধ করে রাখবে? সুযোগ মূলত আমাদের কাজের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। সফলতার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করা এতটাই জরুরি যে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেকে সফল হতে পারে না। কেননা তার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ ভুল ছিল। কলিন পাওয়েল বলেছেন- 'সাফল্যের পেছনে গোপন কোনো রহস্য নেই। এটা কেবল প্রস্তুতি, পরিশ্রম এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সম্মিলিত ফলাফল।'

আফ্রিকান বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন- 'সফলতার ভিত্তিতে আমাকে বিচার করো না। আমাকে বিচার করো, ব্যর্থতার পর জীবনে কতবার ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছি তার ভিত্তিতে।' সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বলেছেন- 'Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue thats counts.'

আমি যত মোটিভেশনাল লেখকদের বই পড়েছি চিন্তা-চেতনায় মাওলানা

জীবনকে এক পেয়ালা চায়ের সাথে তুলনা করেছেন আল্লামা শেখ সা'দী। তিনি বলেন, 'জীবন হচ্ছে এক পেয়ালা চা। যতই তৃপ্তিসহকারে আমরা তা পান করি ততই দ্রুত তলার দিকে অগ্রসর হতে থাকি।'

জালালুদ্দিন রুমির (১২০৭-১২৭৩) সমপর্যায় কিংবা তার কাছাকাছি জায়গায় অবস্থান করতে পারেন এমন একজন ব্যক্তি আজো পাইনি। রুমিকে অনেকেই একজন ইসলামী পণ্ডিত মনে করেন। কিন্তু রুমির তারচেয়েও বড় পরিচয় তিনি একজন বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, বড় মাপের একজন কবি ও মোটিভেশনাল লেখক ছিলেন।

তিনি শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের কবিই নন খোদ অ্যামেরিকাতেও তিনি 'বেস্ট সেলিং পয়েট' হিসেবে পরিচিত। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থাবলির মধ্যে মসনবী ও দিওয়ান তাঁকে অমর করে রেখেছে। মসনবীতে আছে সাহিত্যের এমন এক প্রবাহ যদি তুমি এটা পড়তে শুরু করো তাহলে এর আনন্দ থেকে নিজেকে বিরত রাখা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়বে। বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে মসনবীর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

পারস্যে আজো পবিত্র কুরআন ও হাদিসের পরই মসনবীকে যথার্থ পথপ্রদর্শক বলে মনে করা হয়। পারস্যবাসী এটাও মনে করেন, মসনবীকে যদি কুরআন বলে চালিয়ে দেয়া হতো তাহলে অনেকে হয়তো বুঝতেও পারতো না তিনি কুরআন পাঠ করছেন নাকি মসনবী পড়ছেন। মসনবী লেখার মাধ্যমে রুমি নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের সন্ধান লাভ করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রুমির মাত্র দুটো কথার দিকে চোখ রাখো। আজকের পৃথিবীর সব মোটিভেশন স্পিকার ও লেখকদের গা শিউরে উঠবে। কী দারুণ কথামালা– এক. 'আগামীকাল করব এটা বলো না। আজ তো গতকালেরই আগামীকাল ছিল, কী করতে পেরেছ?' দুই. 'সৌন্দর্যকে বিশ্বাস করো না, একটি ব্রণই যথেষ্ট। সম্পদকে বিশ্বাস করো না, একটি স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট। রবকে বিশ্বাস করো, তিনি সব কিছুর জন্য যথেষ্ট।'

তুমি নিজেকে ব্যর্থ ভাবছো অথচ মহান আল্লাহ তোমাকে উদ্দেশ করেই বলেছেন 'নিশ্চয়ই বিশ্বাসীরা সফল হয়। বিশ্বাসের সাথে যদি তারা নিজেদের

মানুষকে নয় তোমার প্রয়োজনগুলো শুধু আল্লাহকে বলো। আল্লাহ হয়তো তোমার চাহিদা পূরণ করে দেবেন অথবা চাহিদার চেয়েও বেশি দেবেন। কিন্তু এই বিশ্বাস রাখো আল্লাহ তোমাকে কম দেবেন না

নামাযে বিনয়াবনত হয়, অনর্থক কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে, অসহায়দের সাহায্য করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে তাহলে তারা উভয় জগতেই সফলকাম।' (কুরআন, ২৩:১-৪)

তুমি বলছো তোমার জীবনে অনেক কষ্ট অথচ আল্লাহ বলছেন-'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি।' (কুরআন, ৯৪:৬) তুমি হয়তো ভাবছো তোমাকে সাহায্য করবার কেউ নেই অথচ আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করার জন্যই বলছেন- 'মুমিনদের সাহায্য করা আমি আল্লাহর জন্য আবশ্যক।' (কুরআন, ৩০:৪৭) তুমি দেখতে খুবই কুৎসিত তাই হীনমন্যতায় ভুগবে অথচ তোমাকে উদ্দেশ করেই আল্লাহ বলেছেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম আকৃতিতে।' (কুরআন, ৯৫:৪) তুমি বলবে তোমার কোনো সঙ্গী নেই অথচ আল্লাহ বলছেন- 'ভয় করো না, আমি সবসময় তোমার সাথেই রয়েছি।' (কুরআন, ২০:৪৬)

সুতরাং মানুষকে নয় তোমার প্রয়োজনগুলো শুধু আল্লাহকে বলো। আল্লাহ হয়তো তোমার চাহিদা পূরণ করে দেবেন অথবা চাহিদার চেয়েও বেশি দেবেন। কিন্তু এই বিশ্বাস রাখো আল্লাহ তোমাকে কম দেবেন না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি নিজের ওপর আস্থা রাখো, ধৈর্য ধরো, দেখবে আল্লাহ সব সহজ করে দিয়েছেন।

তোমাকে বুঝতে হবে পৃথিবীর কোনো কিছুই খারাপ না। আল্লাহ সব কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। সমস্যাটা হলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির। আমরা কিভাবে সেগুলো দেখি। নিজের ভেতরের আনন্দকে খুঁজে বের করো এবং সেটাকে অনুসরণ করো। সাফল্য একটা দক্ষতা মাত্র। এক অর্থে সাফল্য খুব বড় জিনিস নয়, বড় জিনিস হলো সার্থকতা। ফুলের অনেক বৈচিত্র্য বা রঙের জৌলুশ আছে। এগুলো তার সাফল্য। কিন্তু যে গন্ধ দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে তা হলো তার সার্থকতা।

তোমাদের প্রতিটি কাজ হতে হবে অন্যের কল্যাণের জন্য এবং সেই কাজ আনন্দের সাথে করতে হবে। শুধু পুরস্কারের জন্য কাজ করে বোকারা। কেননা পুরস্কার অর্জন ব্যর্থ হলেই আসে হতাশা। তোমাদের উচিত মানুষের কাজের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া। অন্যকে সাহায্য করা, উৎসাহ দেওয়া। অন্তত কাউকে সাহায্য করতে না পারলেও মনের দিক থেকে উপকারী হওয়া। কারো সাফল্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।

গল্প

পথের সন্ধানে

নাবিউল হাসান

অর্ধেক লাউয়ের খণ্ডটা নিয়ে চিল্লাতে চিল্লাতে বেরিয়ে এলো আবিদের দাদি। নালিশ দেয় মিলনের বাবার কাছে। মাচার ওপর সুন্দরভাবে দোল খাচ্ছিল লাউগুলো। ধান কাটা কাঁচিটা দিয়ে কখন যে মিলন এই কাজ করেছে টের পাননি রুহুল মিয়া। মিলন তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। নয় বছরের এক ডানপিটে ছেলে। তার বিরুদ্ধে লোকজনের অভিযোগের শেষ নেই। নানান জনের কাছ থেকে দিনমজুর রুহুল মিয়াকে নিত্যদিন কত কথা যে শুনতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এই মানুষটি সারাদিন পরিশ্রম করে যা পায় তাই দিয়ে কোন রকমে সংসার

চালায়। ছেলেকে নিয়ে ভাবার সময় কই আর? প্রায় দিনই তো হালকা পাতলা শাসন করেন ছেলেটাকে। মিলনের দাদা-দাদী বেঁচে নেই বলে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়াও লাগে। ওকে মারলে যেন নিজেরই কষ্টটা বেড়ে যায়। অন্য দিকে মিলনের মা একজন সহজ সরল মহিলা। ছেলেকে মারলে তিনিও কান্না ধরে রাখতে পারেন না। তাই প্রতিবেশীদের অভিযোগ ও অপবাদগুলো নীরবে হজম করে যেতে চায়। কিন্তু এরপরেও মানুষের কথা আর কত সহ্য করা যায়? গ্রামের এক মুরব্বির সাথে ছেলের সম্বন্ধে পরামর্শ করলো রুহুল মিয়া। এমন বেয়াড়া আচরণ থেকে রক্ষা পেতে তিনি দূরের কোন আত্মীয় থাকলে সেখানে রেখে পড়াশোনা চালানোর পরামর্শ দিলেন। ক্লাস ফোরে পড়ুয়া ছেলেকে এত তাড়াতাড়ি বাইরে কিভাবে দিবে তাও ভাবিয়ে তোলে তাকে। বাইরে রেখে লেখাপড়া করানোর সামর্থ্যও তার নেই। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন তিনি। বাড়ির কাছে পাড়ার লোকদের একটা জটলা দেখে এগিয়ে যান রুহুল মিয়া। তাকে দেখেই লোকজন গালিগালাজ বর্ষণ করতে থাকলো একাধারে। বিব্রত হয়ে সে লক্ষ করলো ছেলেকে বেঁধে রাখা হয়েছে একটি খুঁটিতে। ভয়ে ও আতঙ্কে কাঁপছিল মিলন। "ছেলেকে শাসন করতে পারো না মিয়া? দিনে দিনে কেমন বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে ও।" বলছিলেন আসগর আলী মাতব্বর। মাতব্বরের পা জড়িয়ে ধরেন রুহুল মিয়া। "আমার এই ছোট ছেলেটাকে এবারের মতো মাফ করে দেন চাচা। ওকে এবার গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দিবো।"

চাপা ক্ষোভ নিয়ে ছেলেকে ফিরিয়ে আনেন বাড়িতে। পরদিন ঢাকায় রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ছেলেকে কোন রিকশা গ্যারেজের কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। তাতে এই নিত্যদিনকার বিচার-অভিযোগও শুনতে হবে না, বরং কিছু টাকাও আসতে পারে। এ বিষয়ে মিলনের মায়ের সাথে কথা বলেন রাতে। দিনের ঘটনার কারণে রাগে অভিমানে জ্বলছিলেন তিনিও। "এমন বেয়াড়া ছেলের প্রতি আর সোহাগ দেখাতে চাই না" সাফ জানিয়ে দেন রুহুল মিয়াকে। মিলন তখনও ঘুমায়নি। চোখ বন্ধ করে ঘুমের অভিনয় করছিল। এই অভিনয় না করলে হয়তো দ্বিতীয়বার পিটুনি খেতে হতে পারে যেকোন মুহূর্তে। তবে বাবা-মায়ের ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত শুনে ভিতরে শুকিয়ে গেছে কলিজাটা। ঢক ঢক করে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। চোখের ভেতর থেকে পানি বের হতে চাচ্ছে কিন্তু জোর করে চেপে রাখতে হচ্ছে। একদিক থেকে অন্যদিকে কাত ঘুরাতেও ভয় পাচ্ছে।

একটি গভীর জঙ্গলে কিভাবে ঢুকে পড়লো মিলন বুঝতে পারেনি। এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না সে। অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও একদিকে ঝাপসা আলোয় সরু একটা পথ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে যেতেই কালো কুচকুচে একটা বিড়াল এক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বড্ড ভয় পেয়ে যায় মিলন। চিৎকার দিতে গিয়ে আটকে যায় সে, গলা থেকে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না। এমন সময় বিড়ালটাই বলে উঠলো, "কিরে তুই

আমাকে দেখেই ভয় পাচ্ছিস এখন? কয়েক দিন আগে তো ধারালো ফলাটা ছুড়ে আমার বাম চোখটা নষ্ট করে দিলি। আজকে একচোখে তাকিয়ে আছি দেখে অবাক হচ্ছিস খুব। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা হতভাগা!" ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল মিলন। খানিকটা পেছনে চলে আসতে থাকে সে। কক করে চেঁচিয়ে উঠে একটা ল্যাংড়া মুরগি। আচমকা এই শব্দ শুনে ধড়াস করে লাফিয়ে উঠে হৃদপিণ্ডটা। ওরে বাবা বলে একটা চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করে মিলন, কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠে আওয়াজই বের হতে চাচ্ছে না। এর মধ্যে পায়ে ঠোকর বসিয়ে দিতে লাগলো মুরগিটা। এরপর বললো "তুই দুইদিন আগে কাড়াল দিয়ে আমার পা ল্যাংড়া করে দিয়েছিলি, আজকে আবার কষ্ট দিলি..? তোকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।" মুরগির কথা শুনে ভোঁ একটা দৌড় দিয়ে সামনে যেতে লাগলো মিলন। শত কষ্ট করেও আগের মতো স্পিড বাড়াতে পারে না সে। প্রাণপণ দৌড়াতে থাকে তবুও। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে পেছনে ফিরে তাকায়নি মিলন। মুরগিটা কতদূর এসেছে দেখার জন্যে পেছন ফিরে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। জঙ্গল পেরিয়ে এখন অনেকখানি সামনে চলে এসেছে মিলন। মুরগিটাকেও দেখা যাচ্ছে না আর। এবার বুঝি ভালোভাবে বাড়িতে ফিরে যাওয়া যাবে। কিন্তু সামনে তাকিয়ে আবারও হতভম্ব হয়ে যায়। অচেনা এ কোন জায়গা মনে পড়ছে না কোনমতেই। তেমন গাছপালা নেই এখানে। কিছু কাশবন আর এলোমেলো পুরাতন কিছু গাছের গুঁড়ি যেখানে

সেখানে পড়ে আছে। এমন সময় হঠাৎ তার মনে হলো এইসব তো বাঘের শিকার করার জায়গা। দুইদিন আগে মণ্ডল কাকুর দোকানে টেলিভিশনে এই জায়গাটায় দেখালো। যেখানে বাঘ আর বন্য মহিষের ভয়ঙ্কর মারামারি দেখে দৌড়ে বাড়িতে চলে আসতে হয়েছে। লম্বা কেশওয়ালা সিংহ নামক প্রাণীটার চেহারার কথা ভাবতে ভাবতেই এক ভয়ঙ্কর গর্জন ভেসে এলো কানে। শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে মিলনের। নাক দিয়ে লম্বা একটা শ্বাস নেয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে জোরে একটা চিৎকার দিয়ে উঠে, "বাঁচাও, সিংহ খেয়ে ফেললো।" কিন্তু এবারও শব্দ বের হলো না গলা থেকে। সিংহটি তার একদম কাছাকাছি চলে এসেছে। সামনের পা দুটো দিয়ে চেপে ধরলো মিলনকে।

তারপর বাম কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে আরেকটা গর্জন দিলো। এমন সময় জীবনের শেষ চেষ্টা হিসেবে জোরে একটা লাফ দেয়। সঙ্গে চিৎকার করে উঠে, "বাঁচাও, সিংহ খেয়ে ফেললো।" দুই চোখে অন্ধকার দেখছে সে। মস্ত এক আছাড় দিয়েছে সিংহটা। এতক্ষণে হাড়গোড় হয়তো একটাও আর আস্ত নেই। এই সময় কালেমা পড়ে বিদায় নেয়া যেত, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার চিরসঙ্গী। ফলে সেটিও মনে পড়ছে না। সিংহটি এখনো কামড় বসাচ্ছে না কেন বুঝতে পারে না মিলন। চোখ দুটো আরেকবার খোলার চেষ্টা করে ভয়ে ভয়ে। কিন্তু একি? বাবার ওপর দিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে প্লাস্টিকের চেয়ারটাতে আছড়ে পড়েছে সে। ওর বাবা রুহুল মিয়া-ই নাক ডেকে সিংহের মতো গর্জন দিচ্ছিল। মিলনের চিৎকার ও লাফিয়ে চেয়ার ফেলে দেয়ার ঘটনায় হম্বিতম্বি করে জেগে ওঠে মা-বাবা। চেপে রাখা কান্নাকে দ্বিগুণ শব্দে বেগবান করে মিলন। একি স্বপ্ন, নাকি ভালো হয়ে যাওয়ার জন্য কোন পথের সন্ধান? ছেলের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে মায়া বিগলিত স্বরে তড়িঘড়ি করে নেমে আসে মা। জড়িয়ে ধরে মিলনকে। "আমি আর কারও কোন ক্ষতি করবো না মা। ভালো হয়ে যাবো। আমাকে তোমাদের থেকে আলাদা করে দিও না।" কান্নাজড়িত কাতর কণ্ঠে অনুরোধের সুর মিলনের। এগিয়ে আসে ওর বাবা। খুব মিষ্টি করে জানিয়ে দেয়, "তুই ভালো হয়ে গেলে আমি আর কিছু চাই না মিলন। তোকে বুকের কাছেই আগলে রাখবো সারা জীবন।"

নববর্ষের ডাক

জাকারিয়া আল হোসাইন

নতুন বছর শুরু হলে
স্বপ্ন জাগে মনে
নতুন ভাবে গড়বে জীবন
ভাবে প্রতিজনে,
নতুন বছর করবে শুরু
নতুন কিছু দিয়ে
পরের বছর আসবে আবার
অন্য কিছু নিয়ে।

ভাবতে ভাবতে দেয় যে উঁকি
নববর্ষের ডাক
জীবন থেকে যায় হারিয়ে
স্বপ্ন আঁকা ঝাঁক,
ভাবনাগুলো ভাবনাই থাকে
হয় না কোন কাজ,
অলসতায় দেয় কাটিয়ে
সকাল দুপুর সাঁঝ।

এই যদি হয় ভাবনাগুলো
চলতে থাকে বেশ
শেষ জীবনে পরের ওপর
দিতে হবে ঠেস,
থাকতে সময় এই বছরটি
সাজাও আপন সুরে
অলসতা ছিটকে ফেলো
অনেক অনেক দূরে।

ছোটোদের ঈমান সিরিজ

বন্ধুরা! তোমরা নিশ্চয়ই গল্প শুনতে পছন্দ করো। তোমাদের জন্য থাকছে অসাধারণ ছয়টি গল্পের বই। এ-সবই সত্য গল্প। আশা করছি তোমরা এক নিমিষেই শেষ করে ফেলবে!

আল্লাহ আমার রব

ফেরেশতারা নূরের তৈরি

আসমান থেকে এলো কিতাব

দুনিয়ার বুকে নবি রাসূল

বিচার হবে আখিরাতে

তাকদীর আল্লাহর কাছে

‘ঈমান সিরিজ’ পেতে তোমাদের কাছের লাইব্রেরিতে খোঁজ করো

সমর্পণ
প্রকাশন
০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪২

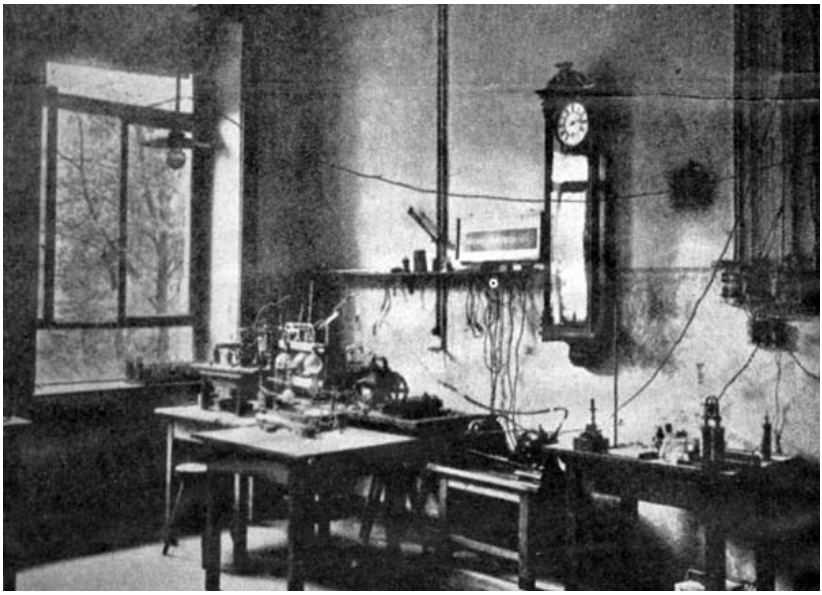

রঞ্জন রশ্মি

আল জাবির

বিজ্ঞানীরা যেমন অজানাকে জানার জন্য, বিভিন্ন রহস্য উদঘাটন করার জন্য নানান জিনিস আবিষ্কার করেন তেমনি ভুলবশতও আবিষ্কার হয়েছে অনেক কিছু। বিজ্ঞানের অনেক মহান আবিষ্কারগুলোর মতো এক্সরেও আবিষ্কার হয়েছিলো ভুলবশত। এক্সরে এবং দৃশ্যমান লাইট অনেকটাই এক জিনিস। উভয়ই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফর্মে চলে এবং এই এনার্জিকে ফোটন বহন করে দৃশ্যমান আলো এবং এক্সরে উভয়ই অ্যাটমের মধ্যের ইলেকট্রনের নড়াচড়া থেকে উৎপন্ন হয়। যখন ইলেকট্রন তার কক্ষপথ থেকে নিম্নস্তরে নেমে আসে, ইলেকট্রন কিছু এনার্জি ত্যাগ করে, আর এই এনার্জি ফোটন আকারে ত্যাগ করে। এক কথায় এক্সরে হলো সাধারণ লাইটের সুপার পাওয়ার ফুল ভার্সন। সাধারণ আলোর মতো এটিও একই স্পিডে ভ্রমণ করতে

পারে। যদি কোন কাগজের টুকরাকে নির্দেশ করে এক্সরে লাইট ছুড়ে মারা হয় তাহলে দেখা যাবে সাধারণ আলোর চেয়ে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হাজার গুণ ছোট। এর এনার্জি অনেক বেশি, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খাটো এবং ফ্রিকুয়েন্সি অনেক বেশি হওয়াতে এটি এমন সকল বস্তুকে ভেদ করতে পারে, যেটা সাধারণ আলো ভেদ করতে পারে না।

এবার আসি এক্স-রের আবিষ্কারকের কথায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজন পদার্থবিদ পরীক্ষাগারে সামান্য ভুল থেকে আবিষ্কার করেন এক বিস্ময়কর রশ্মির। কিন্তু সেই বিজ্ঞানী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন। তিনি বারবার একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন যেন নিজের ভুল সংশোধন হয়ে যায় এবং বারবার একই ফলাফল পেতে থাকেন। এক সময় তিনি ভাবলেন, হয়তো তার মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই। তিনি পাগল হয়ে গেছেন। অবশ্য তার এরকম ভাবনা অমূলক নয়। কারণ, তিনি যে রশ্মি আবিষ্কার করেছেন, সেটা অনেকটা অদ্ভুত। যেমন, তা অনেক দেহের মাংস ভেদ করে প্রবাহিত হলেও, ঠিকই হাড় দ্বারা প্রতিহত হচ্ছিলো। এই অদ্ভুত রশ্মিকে তিনি তার মনের অলীক কল্পনা ভেবে ভুল করছিলেন। কিন্তু তার ভুল ভাঙলো যখন বুঝতে পারলেন, তিনি একা নন, তার স্ত্রীও একই দৃশ্য অবলোকন করছেন।

আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে থাকা সেই পদার্থবিদ হচ্ছেন উইলহেম রন্টজেন। আর সেই অদ্ভুত রশ্মির নাম রঞ্জন রশ্মি বা এক্স-রে। ক্লাসের দুষ্টু ছেলে উইলহেমের জন্ম হয়েছিলো ১৮৪৫ সালের ২৭ মার্চ জার্মানির নিম্ন রাইন প্রদেশের লেনেপ অঞ্চলে। তার পূর্ণনাম উইলহেম কনরাড রন্টজেন। তিনি ছিলেন কাপড় বিক্রেতা পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। জন্ম জার্মান মুলুকে হলেও তার শৈশব কেটেছিলো বর্তমান নেদারল্যান্ডসের আপ্লেডুর্ন শহরে। সেখানে তাকে ভর্তি করানো হয় মার্টিনাস হার্মান ফন ডুর্নের বোর্ডিং স্কুলে। এদিকে স্কুলের পাঠে মনোযোগী ছিলেন না কিশোর উইলহেম। তার শুধু গ্রাম, অরণ্যে প্রকৃতির মাঝে মিশে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগতো। তবে পড়াশোনায় দুর্বল হলেও তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসতেন। যন্ত্রপাতির প্রতি এই ভালোবাসার কারণে তাকে ১৮৬২ সালে ভর্তি করানো হয় ইউট্রেক্তের এক কারিগরি স্কুলে। এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় তার বিরুদ্ধে সেই শিক্ষক অবমাননার অভিযোগ উঠেছিলো। স্কুল বহিষ্কারের মতো গুরুতর শাস্তি যেকোনো ছাত্রের শিক্ষাজীবনে ধাক্কা দিতে পারে।

উইলহেম কনরাড রন্টজেন

কিন্তু উইলহেম এসব ভুলে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৮৬৯ সালে তিনি গবেষণা জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিলো ওয়ারজবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৮৮ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে এখানে যোগদান করেন। এখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি তার বিশ্ব কাঁপানো রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। সাধারণ উইলহেমের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প এখানেই রচিত হয়েছে। টানা সাত সপ্তাহ ধরে নিজের গবেষণাগারের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন উইলহেম রন্টজেন। ঠিক কী কারণে তিনি হঠাৎ এরকম আচরণ করছেন, তা বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের কারো স্পষ্ট নয়। সেখানে রাত দিন গবেষণা করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানী উইলহেম। ১৮৯৫ সালের দিকে তিনি ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। তার কাজ ছিল অতিরিক্ত নিম্নচাপে থাকা গ্যাসের ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত করা। সেই বছর ৮ নভেম্বর তিনি কাজ করার সময় লক্ষ করলেন, গ্যাসের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় কিছু রশ্মি উদ্ভূত হচ্ছে। এখানে বলে রাখা দরকার, উইলহেম রন্টজেন যে কক্ষে তার গবেষণা কাজ করতেন, সেটি ছিল আলোকচিত্রীদের 'ডার্ক রুম'-এর মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাছাড়া যে টিউবের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হচ্ছিলো, তা ছিল বিভিন্ন অস্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে আবৃত। তাই আলোকতরঙ্গ সেই অস্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে প্রবাহিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, বিদ্যুৎ প্রবাহে সৃষ্টি হওয়া রশ্মি সেই পুরো আবরণ ভেদ করে দুই মিটার দূরত্বে টিউবের বিপরীত দেয়ালে রাখা বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড পর্দার ওপর উজ্জ্বল প্রতিপ্রভাব সৃষ্টি করেছে। উইলহেম ভাবলেন, তিনি বোধ হয় চোখের ভুল দেখছেন অথবা তার কাজে কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। সেই ভুল ভাঙার অধ্যবসায়ে তিনি টানা সাত সপ্তাহ একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটান। কিন্তু প্রতিবার একই ঘটনা ঘটতে থাকে। তিনি বিভিন্ন ধাতব বস্তুর মাধ্যমে সেই রশ্মিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। তাছাড়া তিনি নিজেও এই অদ্ভুত রশ্মির ধর্ম সম্পর্কে দ্বিধায় ছিলেন। শেষে তিনি তার স্ত্রী আনাকে তলব করলেন। উদ্ভ্রান্ত বিজ্ঞানী তার স্ত্রীর হাত সেই রশ্মির যাত্রাপথে মেলে ধরলেন। তখন আনার হাতের আঙুলে বিয়ের আংটি পরিহিত ছিল। অবাক চোখে উইলহেম দেখলেন, দেয়ালে একটি ভৌতিক হাতের দৃশ্য ভেসে উঠেছে। সেই হাতের মাংসগুলো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। কিন্তু হাতের অস্থিগুলো স্পষ্ট চিত্রিত হয়ে আছে। আর বিয়ের আংটির স্থলে গাঢ় কালো রঙের ছায়া দেখা যাচ্ছে। আর এটি ছিল পৃথিবীর প্রথম রন্টজেনোগ্রাম। এই দৃশ্য দেখে তার স্ত্রী আনাও ভয়ে শিউরে উঠলেন। আর এখানেই বন্ধ ঘরের সকল রহস্য এবং অলৌকিকতার ইতি ঘটলো। উইলহেম বুঝতে পারলেন, তিনি পাগল হয়ে যাননি। তার স্ত্রীও একই দৃশ্য অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ রশ্মি

আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আর এভাবে তিনি দেখিয়ে দিলেন, ভৌত পদার্থের ওপর ক্যাথোড রশ্মির প্রভাবে সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত রশ্মির।

যেহেতু সেই রশ্মির বৈশিষ্ট্য সবার অজানা ছিল, তাই তিনি একে নাম দিলেন এক্স-রে। অনেকে একে রন্টজেন রশ্মি হিসেবে ডাকা শুরু করে। আজ ১০০ বছর পরে রঞ্জনরশ্মির বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীদের অজানা নয়। কিন্তু তারপরেও সেই এক্স নামটুকুর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। রঞ্জনরশ্মির আগমন বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লবের ডাক দিলো। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হলো চিকিৎসাক্ষেত্র। যেহেতু এই রশ্মি মাংস ভেদ করতে পারলেও অস্থি দিয়ে প্রতিহত হয়, তাই এটি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীর ভাঙা হাড়ের চিকিৎসা করা সহজ হয়ে যায়। রঞ্জনরশ্মি রীতিমতো যশস্বী ব্যক্তিত্বে পরিণত করলো উইলহেম রন্টজেনকে। তার এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৯৬ সালে রামফোর্ড এবং মাতেউচি পদকে ভূষিত করা হয়।

পরবর্তী বছর তিনি এলিয়ট ক্রেসন পদকে ভূষিত হন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক বার্নার্ড পদকে পুরস্কৃত করা হয় উইলহেম রন্টজেনকে। কিন্তু এরকম এক ডজন পদকে ভূষিত হলেও উইলহেম রন্টজেনকে অন্যান্য পদকপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের থেকে আলাদা করেছে এক নতুন পদক। সেটি হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সম্মানজনক নোবেল পুরস্কার।

১৯০১ সাল থেকে শুরু হয় এই সম্মানজনক পদক প্রদান যা শতবর্ষ পরেও সমান গুরুত্বের সাথে প্রতি বছর বিভিন্ন খাতের সেরা কীর্তিমানদের সম্মানিত করে আসছে। এই পদকের

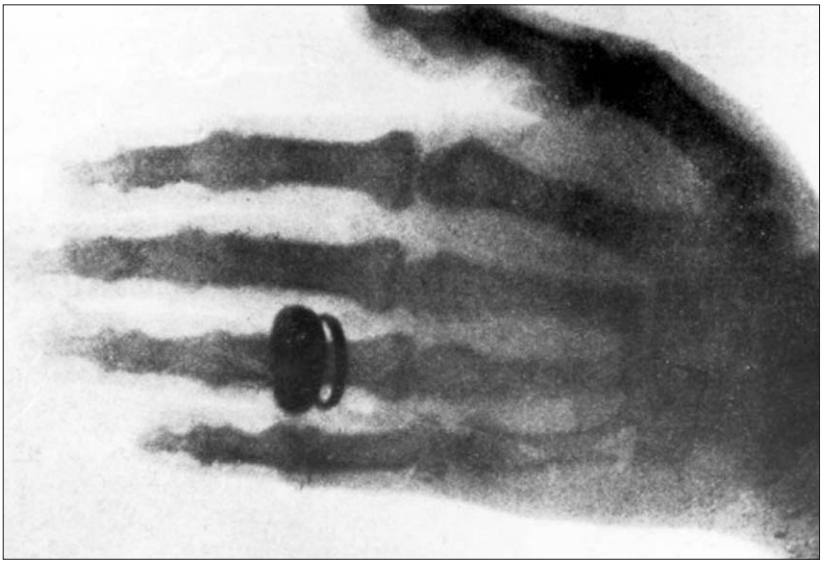

প্রথম আসরে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে পুরস্কৃত করা হয় রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কারক উইলহেম রন্টজেনকে। আর এর মাধ্যমে নোবেলের ইতিহাসে নিজের নাম স্থায়ীভাবে লিখে ফেললেন এই বিজ্ঞানী। জার্মানিতে জন্ম নেয়া উইলহেম শেষ পর্যন্ত ফিরে যান তার জন্মভূমিতে। কর্মজীবনের শেষটুকু এখানে কাটিয়ে ১৯২০ সালে অবসর গ্রহণ করেন এই গুণী পদার্থবিদ। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে বিজ্ঞানীর উইলহেমের দিনকাল ভালো যাচ্ছিল না। তিনি নিজে অন্ত্রের ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার ওপর তার স্ত্রী আনা রন্টজেন আকস্মিক মৃত্যুবরণ করায় তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

অসুস্থ উইলহেম ক্যান্সারের ধাক্কা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। ১৯২৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ৭৭ বছর বয়সে এই মহান বিজ্ঞানী মারা যান। পরবর্তীতে তার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী, তার যাবতীয় ব্যক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক নথিপত্র ধ্বংস করে দেয়া হয়। রঞ্জনরশ্মির কারণে এখনো কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছে। সেই সাথে অমর হয়ে আছে উইলহেম রন্টজেনের নাম। অবশ্য বিজ্ঞানীদের আসর ছাড়াও তার নাম আরেক স্থানে চিরদিনের জন্য অমর হয়ে আছে। সেটা হচ্ছে পর্যায় সারণি।

২০০৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী উইলহেম রন্টজেনকে সম্মানিত করে IUPAC কর্তৃক ১১১ নং মৌলিক পদার্থের নাম রাখা হয় রন্টজেনিয়াম (Rg)। এই নাম শুধু একজন বিজ্ঞানীর নাম নয় বরং পৃথিবীর প্রতিটি স্বপ্ন দেখা তরুণের জন্য অনুপ্রেরণার নাম। তার অনুপ্রেরণায় পৃথিবীতে নতুন নতুন আবিষ্কার আর বিপ্লবের জন্ম হবে, এটাই প্রত্যাশা।

বালক তুমি পালক উড়াও

জুবায়ের বিন ইয়াছিন

বালক তুমি পালক উড়াও আজ
বাজাও তোমার দীপ্র মনের তাজ
বুকের ভেতর কিসের শঙ্কা-ভয়
খোলো তোমার আপন পরিচয়
এখন তোমার স্বপ্ন বোনার দিন
দিগ-দিগন্তের গল্পে রাখো ঋণ
সামনে অনেক সম্ভাবনার সুর
পায়ের আওয়াজ ছড়াও বহুদূর ।

বিবেকের ক্ষুধা

মাহমুদুল হাসান

এত এত নোংরা ঘেঁটে
কী খুঁজিস ছোট্ট খোকা
দেখছোনা খুঁজছি আহার
তুমিও যে বেজায় বোকা!

এসবে রোগ যে আছে
উঠে পড় এখনি তবে
পেটে মোর পড়লে খাবার
রোগ-শোক সবই সবে ।

রোগ হলে দেখবে কে রে
নিবি তো শয্যা ভূমি
দিয়েছো কি কখনো খেতে
জ্ঞানে পটু ভীষণ তুমি ।

সাদা-কালোয় অপরূপ পাখি দুধরাজ

জাহিদ ইকবাল

পাখি বলতেই তার সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। দুধরাজ তেমনই একটি পাখি। রং শুধু সাদা আর কালো হলেও তাতেই স্বর্গীয় সুষমা এর রূপে। চোখে পড়লে নজর ফেরানো দায়। আর যখন পাখিটি ওড়ে, সে দৃশ্য যে কত অপরূপ! তবে এই পাখিটির দেখা পাওয়া দুর্লভ। পাখিটির ঠোঁট, মাথা, চোখ, পাখা, বুক, পা ও লেজ দেখতে এককথায় অপূর্ব। অনেকে একে স্বর্গীয় পাখি বলে। এদের মাথায় রাজকীয় কালো রংয়ের ঝুঁটি। বিশেষ করে আকর্ষণীয় এদের লেজ। চোখ ফেরানো যায় না, শুধু দেখতেই ইচ্ছা করে। দুধরাজের ইংরেজি নাম এশিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার। বৈজ্ঞানিক নাম টেপসিফোন প্যারাডিসি। অঞ্চলভেদে এরা সুলতান বুলবুল, হোসনি বুলবুল, নন্দনপাখি ইত্যাদি নামে পরিচিত। সুদীর্ঘ লেজ পাখিটির শারীরিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। লেজের জন্যই ছোট আকারের ঝুঁটিওয়ালা পাখিটি অন্য পাখি থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়।

চুলের ফিতার মতো লেজের দুই দীর্ঘ পালক দুই দিক দিয়ে ঝুলে থাকে। মনে হয়

যেন লতাগুল্মের কোনো অংশবিশেষ। লম্বা লেজ দেখলে মনে হতে পারে এ পাখি উড়ে কেমন করে। অবশ্য উড়তে তার কোন সমস্যা নেই।

পাখিটির চিকন গড়নের শরীর। এদের ঠোঁট থেকে লেজ পর্যন্ত মাপ প্রায় ২০ থেকে ২১ সেন্টিমিটার। আর লেজের শেষপ্রান্ত থেকে লম্বা পালক দুটির দৈর্ঘ্য ২২ থকে ২৪ সেন্টিমিটার। দুধরাজের মাথায় কালো রঙের ঝুঁটি আছে। ঝুঁটির চুলগুলো পলিশ করা কালো। ঠোঁট নীলচে, সামান্য বাঁকানো। বুক থেকে শুরু করে গলা, মাথা তেল চকচকে কালো। মাথায় এক দর্শনীয় চূড়া। একটু বাঁকানো নীলচে রঙের তীক্ষ্ণ ঠোঁট। চোখের মণিও নীলচে, কেন্দ্রে সূক্ষ্ম সাদা বিন্দু। পা হালকা লালচে। পিঠের অধিকাংশই ধবধবে সাদা। ডানা ও লেজের পালকও সাদা। কয়েকটা পালকে সাদার মাঝখানে কালো রঙের লম্বা লাইন। লেজের লম্বা দুটি পালক, যা তাকে দিয়েছে অপরিসীম সৌন্দর্য। উড়ার সময় লেজের লম্বা দুধ সাদা পালক দুটি বাতাসে চমৎকার ভঙ্গিমায় আন্দোলিত হয় যা দ্যুতি ছড়ায়। স্ত্রী পাখির লম্বা লেজ হয় না। দেখতে অনেকটা বুলবুলির মতো। এদের পিঠের রঙ হালকা বাদামি, পেটে ধূসরের সঙ্গে সাদার মিশ্রণ। এদের কণ্ঠস্বর তেমন সুন্দর নয়। তবে বিভিন্নভাবে ডাকতে পারে। প্রজনন মৌসুমে মোলায়েম সুরে ডাকাডাকি করে। দুধরাজের স্বভাব বড্ড চঞ্চল। কোথাও দুই মুহূর্ত স্থির থাকার ধৈর্য নেই। এই এসে বসল তো এই আবার উধাও। ছায়াশীতল ঘন-জঙ্গল এদের পছন্দ। দুধরাজ শিকারের আশায় গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে। গরু,

দুধরাজের স্বভাব বড্ড চঞ্চল। কোথাও দুই মুহূর্ত স্থির থাকার ধৈর্য নেই। এই এসে বসল তো এই আবার উধাও। ছায়াশীতল ঘন-জঙ্গল এদের পছন্দ। দুধরাজ শিকারের আশায় গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে। গরু, ছাগল, মহিষ, হরিণ ও শূকর ঝোপঝাড়ে লতাপাতা খাওয়ার সময় কীটপতঙ্গ উড়ে বের হলে এরা সঙ্গে সঙ্গে শিকার ধরে ফেলে

ছাগল, মহিষ, হরিণ ও শূকর ঝোপঝাড়ে লতাপাতা খাওয়ার সময় কীটপতঙ্গ উড়ে বের হলে এরা সঙ্গে সঙ্গে শিকার ধরে ফেলে। সাধারণত এরা নিচুতে বাসা বানায়। গ্রীষ্ম বসন্তকালে গাছের ডালে ছিমছাম ভাবে ঘাস, লতা, মাকড়সার জাল দিয়ে বাসা তৈরি করে এরা। মাটি থেকে আনুমানিক ১০ ফুট উঁচুতে বাসা বানায়। জনপথের পাশে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা বা অশোক গাছের ডালে বাসা বাঁধে। লোকজনের চলাচলের পথের ধারে বাসা বাঁধার কারণ অন্যান্য শত্রু পাখি বা প্রাণী যেন তাদের আক্রমণ করতে না পারে। তাদের বাসার ধারে জলাশয় থাকতে হবে। দেশজুড়ে এদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে চালচলনে লুকোচুপি থাকার কারণে মানুষের নজরে পড়ে না সহজে। মেয়ে পাখিটির নাম দুধরানী। দুধরানীর যেকোনো বিপদে দুধরাজ অন্যরকম আহাজারি করে ক্রন্দন করে। তাদের প্রজনন মৌসুম শুরু হয় বৈশাখে। ডিম দেয় তিন থেকে পাঁচটি। ডিম ফুটতে ১৮ থেকে ২০ দিন লাগে। তবে সবগুলো ডিম ফোটে না। যেগুলো ফোটে তার সব বাচ্চাও বাঁচে না। এদের ছানার মৃত্যুর হার অন্য পাখির চেয়ে বেশি। সে কারণে দুধরাজের সংখ্যা বরাবরই কম। বাবা মা উভয়েই ডিমে তা দেয়। তা থেকে দুই তিনটি ছানা বড় হয়। ডিম থেকে ফোটার পর হালকা গোলাপিই থাকে এদের রং। যৌবনে সে লাল আর মরিচায় আবৃত। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যখন সে যুবক, তখন বদলে যায় রঙ। সাদা-কালোয় হয়ে ওঠে স্বর্গীয় পাখি। এমন রঙ বৈচিত্র্য খুব কম পাখিরই আছে। বড় হতে সময় লেগে যায় আড়াই থেকে তিন বছর।

এমন রঙ বৈচিত্র্য খুব কম পাখিরই আছে।
বড় হতে সময় লেগে যায় আড়াই থেকে তিন বছর।
গড়ে ১০-১২ বছরের জীবন দুধরাজের

গড়ে ১০-১২ বছরের জীবন দুধরাজের। অনিন্দ্য সুন্দর পাখি দুধরাজ। কিন্তু শুধু সুন্দর হলেই তো চলে না, কঠিন দুনিয়ায় বাঁচতে হলে বুদ্ধি আর সাহসও থাকা চাই। তা পর্যাপ্ত আছে দুধরাজের। শত্রুভাবাপন্ন কেউ বাসার আশপাশে এলে যেন বাজ, ফিঙে বা অনেক বড় পাখিকেও এরা তাড়িয়ে বেড়ায়। সে কারণে অনেক নিরীহ পাখি এদের বাসার কাছে বাসা তৈরি করে। প্রতিদিনিই পুরুষ ও মেয়ে পাখি পানিতে গোসল করে। তাই জলাশয় বা পানির আধারের আশপাশে তাদের বাসা বাঁধার আরেকটি কারণ। এদের শত্রু ঝড়, বৃষ্টি, বাদল, গুইসাপ, সাপ ও হাঁড়িচাচা পাখি। ঝড়ে গাছ ভেঙে কিছু ডিম নষ্ট হয়। কিছু সাপ জাতীয় প্রাণী খেয়ে ফেলে। আর কাক, হাঁড়িচাচা পাখি বাচ্চা খেয়ে ফেলে। পাখিকুলের মাঝে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে এই দুধরাজ বা প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচার পাখি বেঁচে আছে। দুধরাজ এক এলাকায় বেশি দিন থাকে না। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বাংলাদেশ থেকে এই পাখি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশে পাওয়া গেলেও পঞ্চগড় ও উত্তরাঞ্চলে তাদের বেশি দেখা যায়। দেখা যায় সুন্দরবনেও। ঘন ঝোপঝাড় তাদের পছন্দের জায়গা। প্রকৃতির বিরূপ আচরণ ও শত্রুদের মোকাবিলা করে এরা বংশ বিস্তার করে আজও বেঁচে আছে। কিন্তু প্রকৃতিতে কমে যাচ্ছে দুধরাজের সংখ্যা।

বাবর আজম

ব্যাটিংয়ের নতুন নক্ষত্র

আবু আবদুল্লাহ

ক্যারিয়ারের পাঁচ বছরও পূর্ণ হয়নি। ওয়ানডে খেলেছেন মাত্র ৭৪টি, টেস্ট ২৬টি (মার্চ ২০২০ পর্যন্ত) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যেকোনো ব্যাটসম্যানের জন্য এটি সূচনা পর্ব হিসেবেই ধরা হয়; কিন্তু তারপরও বাবর আজমের নাম উচ্চারিত হচ্ছে বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথ কিংবা শন উইলিয়ামসনের পাশাপাশি। অনেকেই তাকে বলেন 'পাকিস্তানের বিরাট কোহলি'।

ক্রিকেট দুনিয়ায় পা রেখেই বাবর দৃষ্টি কাড়েন বিশেষজ্ঞদের। প্রথম দিন থেকেই তার মাঝে পরিণত ক্রিকেটারের ছোঁয়া দেখতে পান সবাই। নিখুঁত টেকনিক, ফুটওয়ার্ক, শট সিলেকশন সব কিছুতেই তিনি আলাদা ছিলেন যে কোন নবীন ক্রিকেটারের চেয়ে। যতই সময় গড়িয়েছে তার প্রমাণও দিয়েছেন বাবর। দুবাইয়ের মরুর বুকে যেমন রানের ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন, তেমনি অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ডের মাটিতে রানের পর রান করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার দুইবারের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং যার মাঝে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন। পাকিস্তানের নতুন ব্যাটিং স্তম্ভ বাবর আজম। মিসবাহ উল হক, ইউনুস খানদের বিদায়ের পর পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা বেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে উঠেছে দলটি। আর এই জায়গাটি পূরণ করেছেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। ২৫ বছর বয়সেই বাবর পাকিস্তান ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছেন। সব ফরম্যাটের ক্রিকেটে সমান কার্যকর তার ব্যাট। যে কারণে এখইন তার তুলনা চলছে বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথদের সাথে। অনেকদিন ধরেই আইসিসির টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা ব্যাটসম্যান তিনি, আছেন টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা পাঁচে। তার চেয়েও বড় কথা অভিষেকের পর থেকেই ধারাবাহিক পারফর্ম করে চলছেন এই ব্যাটসম্যান।

অভিষেক ও উত্থানপর্ব

পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্কটময় সময়টাতে বেড়ে উঠেছেন বাবর আজম। ২০০৯ সালে লাহোরে শ্রীলঙ্কার টিম বাসে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই দেশটিতে অনেক বছর বন্ধ ছিলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

সেই সময়টাতে এই লাহোরেই বেড়ে উঠেছেন বাবর। যখন পাকিস্তানকে হোম ম্যাচও খেলতে হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত কিংবা অন্য কোন দেশে। এরপর পাকিস্তানে ক্রিকেট ফেরাতে যখন মরিয়া দেশটির ক্রিকেট বোর্ড সেই সময় জাতীয় দলে আসেন বাবর। অনেক আলোচনার পর ২০১৫ সালে জিম্বাবুয়ে দল পাকিস্তান সফর করে। সেই সিরিজে নিজ শহর লাহোরে আন্তর্জাতিক অভিষেক বাবরের।

ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ক্রিকেটের মধ্যে। বাড়িতেই ছিলো ক্রিকেটের চর্চা। চাচাতো ভাইদের সাথে বাড়ির উঠানে খেলতেন। তোমরা কি জানো বাবরের চাচাতো ভাই কারা? আকমল ব্রাদার্স-অর্থাৎ কামরান আকমল, আদনান আকমল ও ওমর আকমল। আকমলরা তিন ভাই-ই খেলেছেন পাকিস্তান জাতীয় দলে। তাদের সাথেই বেড়ে উঠেছেন বাবর। ছোট বেলায় বাড়ির উঠানে একসাথে খেলতেন এই চারজন। চারজনই খেলেছেন পাকিস্তান দলে; বিষয়টা বিস্ময়কর তাই না! বাবর আজম পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৫ দলে খেলার পর সুযোগ পেয়েছেন অনূর্ধ্ব-১৯ দলে। ২০১০ ও ২০১২ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছেন। শেষবার পাকিস্তানকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। দুইবারই ছিলেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।

ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী ক্রিকেটার বাবর। কামরান আকমল একবার বলেছেন, ছোটবেলা থেকে তাকে কিছু শিখিয়ে দিতে হতো না আমাদের। ভালো ক্রিকেটারের সব কিছুই আছে তার মধ্যে, আমরা শুধু সমর্থন দিয়েছি।

আদর্শ ব্যাটসম্যানের সব যোগ্যতাই আছে তার। উকেটের চারদিকে শট খেলতে পারেন সমান তালে। আর যার প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে প্রতি ম্যাচে। প্রথম ওয়ানডেতে হাফ সেঞ্চুরির পর ধারবাহিকভাবে রান পেয়েছেন। তবে পুরোপুরি জাত চিনিয়েছেন পরের বছর আরব আমিরাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে। পরপর তিন ম্যাচে খেলেছেন ১২০, ১২৩ ও ১১৭ রানের ইনিংস। সে বছরই ডাক পান টেস্ট দলে। ২০১৭তে অস্ট্রেলিয়া সফরে অ্যাডিলেডে স্টার্ক-হ্যাজেলউল-কামিন্সদের বিরুদ্ধে খেলেছেন ১০০ রানের অনবদ্য ইনিংস। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে প্রভিডেন্সে খেলেন অপরাজিত ১২৫ রানের ইনিংস। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানে হয়। সেখানে বড় কোন ইনিংস না খেললেও মাঝারি কিন্তু কার্যকর কয়েকটি ইনিংস খেলেন।

ওই বছরই অক্টোবরে দুবাই ও আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পরপর দুই ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করেন। মোট কথা এই সময়টাতেই বিশ্ব ক্রিকেটে দাপুটে আবির্ভাব বাবর আজমের। তাকে ভবিষ্যতে গ্রেট হিসেবে বিবেচনা শুরু হয়ে গেছে ততদিনে। অফ ফর্ম এখন পর্যন্ত তাকে ছুঁতে পারেনি। ৭১ ইনিংসে এসে পেয়েছেন ১১তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি, যেটি করতে বিরাট কোহলির লেগেছিল ৮২ ইনিংস।

আগেই বলেছি বাবর আজম রান করেছেন বিশ্বের সব প্রান্তে। গত ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অসাধারণ এক সেঞ্চুরি করে ম্যাচ

জিতিয়েছেন। গত বছর নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে পরপর দুই টেস্টে ব্রিসবেন ও অ্যাডিলেডে খেলেছেন ১০৪ ও ৯৭ রানের ইনিংস। সাধারণত ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট এক্সপার্টরা তাদের মাটিতে রান করতে না পারলে কোন ব্যাটসম্যানকে সেরা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চান না- বিশেষ করে উপমহাদেশের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে। কারণ উপমহাদেশের টার্নিং উইকেটে খেলে অভ্যস্ত ব্যাটসম্যানদের জন্য ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজে রান করা কঠিন। সেখানকার পিচ বানানো হয় এমনভাবে যাতে বলে প্রচুর সুইং ও বাউন্স পায় পেস বোলাররা। পিচে এত ঘাস থাকে অনেক সময় আউটফিল্ড থেকে পিচ আলাদা করা কঠিন হয়ে যায়। ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতি নিয়ে একটি বল যখন হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে মাথার কাছে কিংবা মিডল স্টাম্পে পড়েও সুইং করে অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে চলে যায়- তখনই আসলে ব্যাটসম্যানের আসল পরীক্ষাটা হয়ে যায়।

বাবর আজম ক্যারিয়ারের শুরুতেই এই পরীক্ষায় পাস করেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও একটি জিনিস বাকি ছিলো তার- দেশের মাটিতে রান করা। বাবরের অভিষেকের সময় থেকে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হলেও সেই অর্থে বড় কোন সিরিজ হয়নি। আসল শুরুটা হয়েছে গত বছরের শেষ দিকে। শ্রীলঙ্কার পর বাংলাদেশের সাথে পূর্ণাঙ্গ হোম সিরিজ খেলেছে পাকিস্তান। আর সেই সিরিজে দেশের দর্শকদের সামনে বাবর দেখিয়েছেন তার ব্যাটিং ঝলক। দেশের মাটিতে এই দুটি সিরিজে তার সর্বশেষ ইনিংসগুলো ছিলো - ১০২*, ৬০, ১০০*, ৬৬*, ১৪৩। ওয়ানডেতে তার ব্যাটিং গড় ৫৪, টেস্টে ৪৫। ওয়ানডেতে ১১ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ২৬ টেস্টে সেঞ্চুরি আছে ৫টি।

পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে কেন তাকে এখনই বিশ্ব ক্রিকেটের সেরাদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। টি-টোয়েন্টির কথা কী আর বলতে হবে! সেখানে কিন্তু তিনি আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটসম্যান। ৩৮ ম্যাচ খেলে গড় ৫১ (প্রায়)। সবচেয়ে কম ইনিংসে এক হাজার রান করার বিরাট কোহলির রেকর্ড নিয়েছেন নিজের দখলে (২৬)।

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কও তিনি। আগামীতে যে সব ধরনের ক্রিকেটের নেতৃত্বই তার কাঁধে আসবে সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি- সব ফরম্যাটে সমান তালে খেলতে পারা ব্যাটসম্যান বিশ্বে খুব কমই আছেন। যে কারণেই বাবর আজম তার সমসাময়িক অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম। বরং তার তুলনাটা হচ্ছে এই সময়ের সেরাদের সাথে।

দুইটি শিশু

আমানত মিয়া

একটি শিশু পথের ধারে
পথের ধুলায় খেলে,
রোজ সকালে পুব আকাশে
ইয়ন যে তার মেলে।

একটি শিশু প্রাসাদ ঘরে
অনেক খেলনা আছে,
সকাল-সাঁঝে তারই কাজে
হাজার চাকর পিছে।

দুইটি শিশু মানুষ ভবে
একই খোদার সৃষ্টি,
তবে কেন আমরা মানুষ
করছি বিভেদ দৃষ্টি?

শান্তি ধরায় আনতে হলে
বিভেদ ভুলতে হবে,
সকল শিশু থাকলে সুখে
সুখের পরশ পাবে।

যমুনার তীরে

মেহেদী হাসান সানি

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এক গ্রাম রতনপুর। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বৃহত্তর যমুনা নদী এ গ্রামের প্রধান আকর্ষণ। যেমন চরোৎপাদী তেমন কুলগ্রাসী এ নদী রতনপুরের সাক্ষী হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। ক'দিন যাবৎ গ্রামে প্রচণ্ড শীত। দিনের বেলা সূর্য দেখা দায়। কুয়াশার চাদরে মোড়ানো যেন সমস্ত প্রকৃতি।

কনকনে শীতের সকালে গোসল সেরে নিলো রশিদ। শহরে যাবে। জরুরি মিটিং আছে। উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখল থরথর কাঁপুনি দিয়ে কে যেন বাড়ির দিকে আসছে। রশিদ খুব একটা গুরুত্ব দিলো না। চেয়ারম্যান মানুষ। সারাদিনই বাড়িতে লোকজনের আসা যাওয়া থাকে।

কে! আবুল চাচা না! এতদিন পর

মনে পড়ল আমাগো কথা?

হ বাজান, অনেক দিন বাদে তোমাগো কথা মনে পড়ল। কেমন আছ, বাড়ির সবাই কেমন আছে?

আছে চাচা, আল্লাহর রহমতে ভালোই আছে।

তা এত সকালে কী মনে করে?

শুনলাম এলাকায় নাকি শীতের কম্বল বিতরণ হইবো, আমরা কবে পামু তা-ই জানতে আইলাম?

চাচা, কম্বলতো দিব এমপি সাহেব। গতকাল শুক্রবার দেওনের কথা ছিল, কিন্তু ঢাকায় উনার জরুরি মিটিং থাকায় এলাকায় আইতে পারে নাই। রাতে মোবাইলে কইলো আগামী শুক্রবার সব ব্যবস্থা করতে, উনি আসবেন। গ্রামে গ্রামেতো মাইকিংও হইছে, তুমি শুন নাই চাচা?

হ শুনছি! কিন্তু আমার যে একটা কম্বল খুব দরকার। শীতের কারণে একদম ঘুমাইতে পারি না, সারারাত বইয়া কাঁপন লাগে!

কিন্তু কী করার চাচা, উনারাতো গ্রামে আইসা সভা করবেন, সাংবাদিক ডেকে ছবি উঠাবেন, তারপরে তোমাদের কম্বল বিজয়ী করবেন। পারমিশন ছাড়া আমি এখন কেমনে কম্বল দেই! তই বও, দেখি ঘরে কিছু আছে কি না!

ফুলছড়ি ইউনিয়নের নবীন চেয়ারম্যান রশিদ উদ্দিন। তার বাবা ছিলেন আমির উদ্দিন। আশপাশের দশ গ্রামজুড়ে ছিল তার সুনাম। তারই একনিষ্ঠ কর্মচারী ছিলেন আবুল হোসেন। যমুনার ভাঙনে ঘরবাড়ি সব বিলীন হয়ে গেলে এ বাড়িতেই আবুলের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়। হালের গরু আর খেত খামার দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল আবুলের। মন দিয়ে কাজ করত সে, কোনো দিনও গাফিলতি করেনি। এ জন্য আমির উদ্দিনের আস্থাও পেয়েছিলো বেশ। আবুলের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তার একমাত্র কন্যার বিয়েও দিয়ে দেন আমির। কিন্তু বিয়ের বছরখানেক যেতে না যেতেই এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যায় তার মেয়ে। সেই শোকে আবুল অনেকটা পাথর হয়ে যায়। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্ত রাখে আমির। কিন্তু বছর কুড়ি আগে আমির উদ্দিনের মৃত্যুর পর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় সে। অবশ্য আমির উদ্দিনের স্ত্রী তাকে আরো কিছুদিন থেকে যেতে বলেছিলো, কিন্তু সে আর থাকেনি। সহায়-সম্পত্তি তখন কিছুটা লোপ পেয়েছিলো, বাড়তি লোক রাখা ও খাওয়ানো একরকম বোঝা হয়ে যাচ্ছিল। আবুল বিষয়টি বুঝতে পেরে অন্যত্র চলে যায়। এখন সে গজারিয়া ইউনিয়নের মাঝিঘাট পাহারা দেয়। একা মানুষ, কিই-বা আর করার আছে। কোন রকম দিনাতিপাত করা। বয়স আনুমানিক ৮০ হবে। জীবনের বহু রং সে প্রত্যক্ষ করেছে। বাল্যকালে স্কুলের বারান্দায়ও ঘুরেছে দু'য়েক বছর। দেখেছে ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল আর স্বাধীন বাংলাদেশের নানা চড়াই উতরাই কাহিনী।

রশিদ ঘর থেকে পুরাতন একটা স্যুয়েটার বের করে আনল। আবুলের হাতে তুলে দিয়ে বলল, চাচা আগামী শুক্রবার হাইস্কুল মাঠে চলে আইসেন। বেশি আগে যাওয়ার দরকার নাই। আপনারটা আমি আলাদা করে রাখমুনে। এহন আমার একটু শহরে যাওন লাগবো,

দেরি হইয়্যা যাইতেছে। আপনি বসেন, ডাল-ভাত যা আছে একটু খেয়ে যায়েন।

আমির উদ্দিনের বড় ছেলে রশিদ। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেছে। ছোট দুই বোনের বিয়ে দিয়েছে, আর এক ভাইকে শহরে পড়ালেখা করাচ্ছে। গত ইলেকশনে ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে রশিদ। এরই মধ্যে এলাকায় বেশ নামডাক পড়ে গেছে। সব মানুষের খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সকলের পাশে থাকে সে। এলাকার এমপি, ওসি থেকে শুরু করে শিক্ষক, ব্যবসায়ী, দিনমজুর সবার সাথে তার সম্পর্ক ভালো।

শুক্রবার, দুপুর থেকেই স্কুল মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ। কম্বল বিতরণ হবে দুই হাজার কিন্তু মানুষের উপস্থিতি দশ হাজারেরও বেশি। উত্তরবঙ্গের শীত বলে কথা। তার ওপর এ বর্ষায় যমুনা নদীর ভাঙন ছিল মারাত্মক। সাতটি গ্রাম পুরোপুরি বিলীন হয়ে গেছে, ভাঙনের কবলে পড়েছে আরো দশ বারটি গ্রাম। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ, উদ্বাস্তু হয়েছে শতাধিক পরিবার। আপাতত যে যেখানে পেরেছে কোন রকম আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু শীত থেকেতো আর বাঁচার উপায় নেই।

মাঠের পরিস্থিতি দেখে রশিদ কিছুটা উদ্বিগ্ন। ক'দিন যাবৎ এই কম্বল বিতরণ নিয়েই ছিল তার খুব ব্যস্ততা। এতলোক এখন কী করে সামাল দেবে। স্থানীয় নেতারা এলাকার বাস্তব চিত্র ও চাহিদা বারবার ঊর্ধ্বতন জনপ্রতিনিধিদের জানানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরও কেন এত কম কম্বল বরাদ্দ হলো তা কারো জানা নেই। যাই হোক পরিস্থিতি সামাল দিতে তাৎক্ষণিক আরো কিছু কম্বল ম্যানেজ করা হলো। রশিদ এক ফাঁকে তার ইউনিয়নের লোকজনদের দেখে নিলেন। আবুল চাচার কথাও তার মাথায় আছে। কিন্তু উনাকে এখন পর্যন্ত দেখা গেল না। এমপি সাহেবসহ অতিথিবৃন্দের আসতে আসতে প্রায় বিকাল সাড়ে তিনটা বাজল। কিছু কথা আর আনুষ্ঠানিকতা সেরে কম্বল বিতরণ শুরু হলো। প্রথম দিকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও শেষের দিকে হুলস্থুল বেধে গেল। বিতরণ শেষ হতে হতে সন্ধ্যা নেমে এলো।

কনকনে শীতের রাতে কিছুটা বিষণ্নতা নিয়েই বাড়ি ফিরল রশিদ। পর্যাপ্ত কম্বল না থাকায় বিতরণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, অনেককে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। তার চেয়েও বড় কারণ আবুল চাচা কম্বল নিতে আসল না। বেচারা একটা কম্বলের আশায় গত সপ্তাহে সাঁঝসকালেই ভাঙা শরীর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাত কিলো পাড়ি দিয়েছিলো অথচ আজ বিতরণের দিন তার দেখা মিলল না, এটা কিছুতেই বুঝে আসছে না রশিদের। মনে মনে একটা আশঙ্কাও জাগ্রত হলো তার। ভাবল কাল সকালেই একবার গজারিয়ার মাঝিঘাট থেকে ঘুরে আসবে।

ফজর নামাজ পড়ে ভালো করে গায়ে চাদর মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল রশিদ। কম্বলটাও বেঁধে নিলো মোটর সাইকেলের পিছনে। কুয়াশার জাল আর কাঁচা-পাকা রাস্তা পেরিয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেক পর পৌঁছল মাঝিঘাট। পরিচিত এক দোকানে বসে আগে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল সে।

তা, চেয়ারম্যান সাব, সাঁঝ-সকালেই মাঝিঘাট কী মনে করে?

আসছি আবুল চাচার সাথে একটু দেখা করতে।

আবুল!! ওরে আর কই পাইবা। ওতো ঐপারে চলে গেছে।

ঐপারে চলে গেছে মানে?

মানে আর কী, হায়াত তো আর কম পায় নায়। গত পরশু রাইতে আমার দোকানে বইসা শেষ চা খাইল, মাঝরাত পর্যন্ত হাঁকডাক দিয়া ঘাটও পাহারা দিল। শেষরাতে আর কোন সাড়া শব্দ নাই। ফজর ওয়াক্তে এত ডাকলাম আর উঠল না।

চা আর শেষ করা হলো না রশিদের। চোখের কোণায় দু'ফোঁটা জল ছলছল করে উঠল তার। গত রাতের আশঙ্কাটাই সত্যি হয়ে দেখা দিল। কিন্তু এর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। একজন জনম দুঃখী মানুষ, মৃত্যুর আগে যার কপালে জুটল না সামান্য একটা কম্বল, এই ভাবনাটাই তাকে বেশি পীড়া দিচ্ছে! দোকানদার আরো কী যেন বলে যাচ্ছে, সে দিকে আর মনোযোগ নেই রশিদের। কিছুটা সময় উদাসীন থেকে কবরটা দেখার জন্য বের হয়ে আসল সে।

নতুন মাটি, মনে হয় কিছুক্ষণ আগে কবর দেওয়া হয়েছে। শিশিরভেজা নারিকেলের পাতাগুলো ছড়িয়ে আছে প্রাণহীনভাবে। কুয়াশার ভিড় কেটে সূর্যের আলো ততক্ষণে কিছুটা ফুটে উঠেছে যমুনার তীরে। সে দিকেই অপলক দৃষ্টি রেখে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে রইল শোকাহত এক ক্ষুদ্র জনপ্রতিনিধি।

নতুন প্রভাত

আবুজার গিফারী

অরুণরাঙা কোমল ভোরে
নব আলো সকল দোরে
দেয় ছড়িয়ে আজ,
স্মৃতির পাতায়
প্রীতির খাতায়
নতুন সনে নতুন শাখায়
নিপুণ কারুকাজ।

পাহাড়সম ভুল অগণন
হতাশার অতীত জীবন
ভুলে গিয়ে ভাই,
ফাগুন রাঙা নতুন প্রভাত
স্বাগত জানাই।

রংতুলি

জাবির আহম্মেদ জিহাদ,চিনাডুলী এস.এন উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামপুর, জামালপুর

নাজিফা আফরিন, ৮ম শ্রেণি, হলি চাইল্ড পাবলিক স্কুল, কোনাপাড়া, ঢাকা।

বলতে পারো

জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যার সমাধান

১. ৯০ শতাংশ ২. ব্রেট লি ২০০৭ সালের ৩. টারশিয়ার ৪. আরবি ও বাহরানি দিনার ৫. লজ্জাবতী বানর ৬. আত্মবিশ্বাস ৭. হযরত আনাস (রা) ৮. জান্নাত ৯. ৯ মাসের ১০. তুবা ।

এপ্রিল ২০২০ সংখ্যার প্রশ্ন

১. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোনার খনি কোথায় আছে?
২. 'আমি তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম, আর রাতকে করেছি আবরণ ।' কোন সূরার কত নম্বর আয়াত?
৩. জন ওয়েবস্টারের ইংরেজি ডিকশনারি সঙ্কলনের জন্য কত বছর সময় লেগে গিয়েছিল?
৪. বিশ্বের শতকরা ৭৫ ভাগ ফ্লেমিংগো পাখির জন্ম হয় কোথায়?
৫. ফুটবলার মতিন মিয়ার বাড়ি কোথায়?
৬. সিঙ্গাপুরের রাজধানীর নাম কী এবং কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৭. গুহাবাসী যুবকদের ঘুমাতে ঘুমাতে কেটে যায় কত বছর?
৮. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
৯. ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ও পরমাণু বিজ্ঞানীর নাম কী?
১০. বার্ডস অব প্যারাডাইস ফুলকে প্রথম বিশ্ববাসীর কাছে পরিচয় করিয়ে দেন কে এবং কত সালে?

(সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে কিশোরকণ্ঠ মার্চ ২০২০ সংখ্যায়)

জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতা

পঞ্চগড়: মো: আবির হাসান জীবন, মোঃ মাহবুবুল হাসান রনি, রুবেল ইসলাম, তেঁতুলিয়া; সোহেল রানা, পারভেজ ইসলাম, মো: আলীউল ইসলাম, বোদা; হোসাইন রাসেল, দেবীগঞ্জ, ঐ ।

বাগেরহাট: মো: লিমন মোল্লা, মোতাছিম বিল্লাহ, তরিকুল ইসলাম, মো: জাবেদ আলী, কালিপুর, তরিকুল ইসলাম, মো: গোলাম মাকসুদ, মো: কাউছার, মোঃ ইমরুল হাসান রিফাত, মো: আলী আকবর, মজিব শেখ, সজীব হোসেন হৃদয়, সালমান খান, কচুয়া; নাইম আহমেদ ফারদিন, লিজা আক্তার, কারিমা আক্তার, আব্দুল্লাহ আল জাবির বিন নাসির, বনি আমিন, তাওহিদুল ইসলাম, জান্নাত তুবা, আয়েশা সিদ্দিকা, নাফিসা বিনতে নাসির, হাসিবুর রহমান, মোসাদ্দেক হাবিব রাফিদ,

মোরেলগঞ্জ; মো: আল-আমিন শেখ, মংলা; ঐ ।

চট্টগ্রাম: সাদিয়া বিনতে আলী, হালিশহর; মোঃ মিসবাহ, পতেঙ্গা; নূর উদ্দিন চৌধুরী সাহেদ, মো: সাঈদ আল কাদের, পারভীন আক্তার চাঁদনী, জাহিদ হাসান, মুফাসসিল, তানভীর হোসেন, ফারজানা আক্তার, রাউজান; জান্নাতুন নূর রাইসা, বাকলিয়া; জান্নাতুল নাঈমা সামিয়া, আমিন উল্লাহ সাঈদী, ইমরান হোসাইন, জাহিদুল ইসলাম সাকিব, ডবলমুরিং; আনতারা ফাইরুজ তোহফা, আরিফা আক্তার নুরা, আনিসুর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন, আকবর শাহ; জিয়াউদ্দিন, আনোয়ারুল ইসলাম, সাইফুদ্দিন, মাহমুদুল ইসলাম জিহান, সাখাওয়াত হোসেন রিয়াদ, সাইফুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির রাসেল, সিয়াম উদ্দিন চৌধুরী, বাঁশখালী; উম্মে হাবিবা শাহীন, মোঃ রিপন আলি, ফটিকছড়ি; তাসফিয়া তাবাসসুম, সীতাকুণ্ড; জান্নাতুল সুমাইয়া ইবনাত, চাঁদগাঁও; ঐ ।

মৌলভীবাজার: ইমন আহমদ শান্ত, নিত্য জিৎ দেব নাথ, রাফায়েত আহনাফ রাদ, হাসান আহমদ, মো: মাহমুদ হাসান, বড়লেখা, শামিম আহমেদ, মুরশেদ আহমেদ, রাজনগর, মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ, হোসাইন মোহাম্মদ আলমগীর, শ্রীমঙ্গল; ঐ ।

ঢাকা: জাইমা বিনতে আশিফ, নাফিস ফুয়াদ, মুগদা; উনাইসা, ধানমন্ডি; শাহিন পাঠান, যাত্রাবাড়ী; মিরাজ উদ্দিন আহমেদ, সবুজবাগ; মাইনুল হাসান, নবিলা তাসনিম, ডেমরা; জুহাইর তানজিম, লালবাগ; ইসরাত জাহান রুমি, আশুলিয়া; শার্মিলা আক্তার, শাহজাহানপুর; ঐ ।

ময়মনসিংহ: মো: তাওহীদুল ইসলাম রাজিন, সদর; মোঃ রিপন মিয়া, আশরাফুল ইসলাম ফরহাদ, সাদিয়া ইসলাম সূচনা, সাদিয়া আক্তার রিয়া, শায়লা আক্তার মোহনা, মিফতাহুল জান্নাত রাইসা, ইসরাত জাহান লিয়া, মেহেদী হাসান অপু, সালমান হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; ঐ ।

ফরিদপুর: রাবিয়া শরীফ, মধুখালী; মাশরুর হোসেন, আফসানা ইয়াসমিন, মহাদি হাসান রাতুল, খাইরুল্লাহ, আরাফাত হোসাইন, হাফেজ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সুরাইয়া ইসলাম, বোয়ালমারী; ঐ ।

জামালপুর: মো: আরিফুর রহমান, জাকিয়া ফারজানা, ফারিহা জান্নাত তাহিয়া, জান্নাতুল মাওয়া, নাজমুস সাকিব, মশিউল আলম লিখন, নাজমুল হক, সোহাগ হোসেন, দেওয়ানগঞ্জ; ঐ ।

দিনাজপুর: মো: সাবির হোসেন সিয়াম, জিহাদ সরকার আপন, শাহেদ মোস্তফা সাহেদ, আবির শেখ পৃথিবী, জাইবিন রহমান জিয়ন, বিরামপুর; ঐ ।

কুমিল্লা: হাসিবুল ইসলাম, বরুড়া; মাহমুদুল হাসান নাসিম, মো: আব্দুল্লাহ, হাবিবুর রহমান মিয়াজী, বোরহান উদ্দিন মজুমদার, পারভেজ হোসেন, ইখতিয়ার উদ্দিন মজুমদার, রাশেদুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসেন শাকিল, হাসিবুল হাসান নাঈম, আব্দুল কাদের, সাকিব হোসেন, সামিউল ইবনে শাহাদাত, নাজমুল ইসলাম রাহাদ, সুলতান সালাউদ্দিন, জুবায়ের হোসেন, জাহিদ হাসান, আনোয়ার হোসেন, চৌদ্দগ্রাম; ফাতেমা তুজ সাদিয়া মাওলা, লাকসাম;

ঐ ।

সাতক্ষীরা: হুমাইরা হেমা, ফিরোজ শেখ, ফাইয়াজ সাফওয়াত, সুমাইয়া আফরিন, জে এম তাসনিম রুবাইয়াত, খালেদ সাইফুল্লাহ সাঈদী, তালা; হাফেজ মো: আব্দুস সালাম, আশাশুনি; তাবাসসুম আফরিন তাইমা, শ্যামনগর; ঐ ।

নোয়াখালী: মেহেদি হাসান হৃদয়, মাইজদী; আমির হোসেন রিয়াদ, আব্দুর রহমান রাকিব, ইমরান হোসাইন, নাজমুল ইসলাম মুজাহিদ, কবিরহাট; উম্মে রুম্মান মাহি, মারিয়া আক্তার মারিয়া, চাটখিল; সিনান বিন সাঈফ, সদর; ফাহমিদা আক্তার ইশাত, সোনাইমুড়ী; ঐ ।

নীলফামারী: মো: ইয়াসিন আরাফাত, সাব্বির রহমান, উম্মে সাদিয়া মনি, মাজিদুল ইসলাম, ডিমলা; ঐ ।

কক্সবাজার: এস এম আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ আল জুবাইয়র, আবু সাঈদ, মোঃ নাঈম, রাকিব তাসিন, মোর্তুজা আলী, সদর, টিপু সুলতান, পেকুয়া, ঐ ।

রাজবাড়ী: মো: শাহিন আলম, আমানত মিয়া, আবু সায়েম, হাসান রুহানি, সায়েম ফকির, আমির হামজা, পাংশা, ঐ ।

অন্যান্য জেলাসমূহ: কুলসুমা বেগম, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ; শরিফা খাতুন ইতি, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; আরিফুল ইসলাম, ধামইরহাট, নওগাঁ; সুলতানা নাজনীন, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ; হাবিবুর রহমান, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; নাজমুশ শাবাব, চারঘাট, রাজশাহী; আমেনা ইয়াসমিন, বড়বাড়ি, লালমনিরহাট; এইচ এম ওবায়দুর রহমান, বদরগঞ্জ, আবু সায়েম মেজবাহ, কোতোয়ালি, রংপুর; আবুল হাসনাত নবীন, লামিসা মুন, বোরহানউদ্দিন, ভোলা; আব্দুল্লাহ আল আকিব, জাবের হোসেন নীরব, মাকসুদুল আলম, সদর, লক্ষ্মীপুর; আরিফুল ইসলাম, আব্দুল হাকিম, উল্লাপাড়া, কুরাইশ হোসেন, সদর, সিরাজগঞ্জ; মো: আতিক উল্লাহ, মো: রফিক মনোয়ার সাঈদী, সদর, মাহাদি হাসান মাহিদ, কাপাসিয়া, গাজীপুর ।

এ মাসের পুরস্কার পেলো যারা

১. মো: আবির হাসান (জীবন)
তেঁতুলিয়া; পঞ্চগড়
২. মো: লিমন মোল্লা
কচুয়া; বাগেরহাট
৩. সাদিয়া বিনতে আলী
হালিশহর; চট্টগ্রাম

তোমাদের অংশগ্রহণে জমজমাট থাকুক
কিশোরকণ্ঠের ফেসবুক পেজ

http://www.facebook.com/kishorkanthabd

কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০১৯ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফোরাম সিলেট মহানগর আয়োজিত মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০১৯ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা বলেন, আদর্শ জাতিগঠনে যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের শিক্ষা অত্যাবশ্যক। যে জাতি নৈতিক ও আধুনিক শিক্ষায় যত বেশি উন্নত তারা তত এগিয়ে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশনের মহাসচিব জনাব সালাহউদ্দিন আইউবী বলেন, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ছাড়া শুধু মেধাবী বা মেধা দিয়ে সুস্থ জাতি গঠন করা সম্ভব নয়। আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার কারিগরদের হতে হবে মেধা, যোগ্যতা ও আধুনিক শিক্ষায় পারদর্শী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশেষজ্ঞ সার্জন ডা: মারুফ শাহরিয়ার বলেন, বিশ্বে যোগ্য মানুষেরা এগিয়ে আছে। একটি আদর্শ জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে যোগ্যতা ও মেধার কোনো বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল কর্নেল সৈয়দ আলি আহমদ বলেন, দেশের বর্তমান পরিবেশে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সঠিক পথনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে একটি সৎ, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে

কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফোরাম। মেধাবীদের নিয়ে এমন উদ্যোগ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যম হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফোরামের কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষক জাহিদুল ইসলাম, সিলেট মহানগরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মামুন হোসাইন। ফোরামের সিলেট মহানগরীর পরিচালক মাসউদ মোফাসসির, সহকারী পরিচালক মুবিনুল ইসলাম, মিনহাজুল আবেদিন, রেদওয়ানুর রহমান, ইভান সাকিব, শাহিদ সাইফুল্লাহসহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় প্রায় ৪৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৪০০ জনকে তিনটি ক্যাটাগরিতে (ট্যালেন্টপুল, জেনারেল, বিশেষ) বৃত্তি প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতার মাস উপলক্ষে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফোরাম গাজীপুর মহানগরের টঙ্গী পূর্ব থানার আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃস্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টটি ধূমকেতু উচ্চবিদ্যালয় পাঠক ফোরাম এবং ধূমকেতু পাবলিক বিদ্যালয় পাঠক ফোরামের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এ টুর্নামেন্টে ধূমকেতু উচ্চবিদ্যালয় বিজয়ী হয়। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছে ধূমকেতু উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উজ্জ্বল। এ টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি ছিলেন আবু হানিফ, নির্বাহী সদস্য, কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফোরাম, গাজীপুর মহানগর। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফোরাম টঙ্গী পূর্বের আব্দুল্লাহসহ অন্যান্য নির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

আঁকরে নতুন ভোর

শাহ্ নূর

আয়রে নবীন আয়রে কিশোর
দেখবি সোনা ভোর
তুইতো জানি নয়তো অলস
খোলনা এবার দোর ।

ঈর্ষা হবে সূর্যি মামার
দীপ্তি দেখে তোর
জ্ঞানের দ্যুতি দে ছড়িয়ে,
আঁকরে নতুন ভোর ।

হাঁক ছেড়ে তুই ডাক দেরে ঐ
কাটুক ঘুমের ঘোর
জেগে উঠে দোরটা খুলে
দেখুক সোনা ভোর ।

ছোট্ট বাসা

সামিয়াতুত তানজীম

টুনটুনিটার ছোট্ট বাসা
বেগুন পাতার ভাঁজে,
নতুন বাসা তৈরিতে তাই
ব্যস্ত ভীষণ কাজে ।

ক'দিন আগে ঘর ভেঙেছে
কালবৈশাখীর ঝড়ে,
বেগুন পাতার ছোট্ট বাসা
বড্ড যে নড়বড়ে ।

বৃষ্টি ভেজা খড়ের ঘরে
ছানারা সব ডাকে,
জীর্ণজরা পাতার বাসার
টুনটুনিরা থাকে ।

একটুখানি ঝড়ো হাওয়ায়
পাতার বাসা ছিঁড়ে,
আর না আসুক কালবৈশাখী
টুনটুনিটার নীড়ে ।

ইউনিস্যালাইন®

সঠিক মাত্রা'র খাবার স্যালাইন

WHO & UNICEF
Approved
Formula

www.ibnsinapharma.com

IBN SINA

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি লিঃ
সফিপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৫০% কমিশনে

৪টি প্যাকেজ ৩০ মার্চ পর্যন্ত চলবে

৫৭২০ টাকায় নিম্নোক্ত ২৯টি বই সেট এখন ২৮০০ টাকা

১. রিয়াদুস সালেহীন-১-৪, ২. এন্তেখাবে হাদীস (১-২ একত্রে), ৩. রাহে আমল ১-২, ৪. ঈমানের ৭৭টি শাখা, ৫. ফিকাহ্ মোহাম্মদী, ৬. পয়গামে মোহাম্মদী আটটি ভাষণ, ৭. কবিরা গুনাহ্, ৮. মাতাপিতা সন্তানের অধিকার, ৯. রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন, ১০. বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, ১১. জান্নাতি ২০ রমনী, ১২. ইসলামের সৌন্দর্য, ১৩. আখেরাতের চিত্র, ১৪. জান্নাত লাভের উপায়, ১৫. ইসলামের সামাজিক বিধান, ১৬. দারসূল কোরআন (শেষ ১৪ সূরা), ১৭. ইসলামী আন্দোলন ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল, ১৮ দৈনন্দিন জীবনে পর্দা, ১৯. আদর্শ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ২০. ৩৬৫ দিনের ডায়েরি (কোরআন,হাদিস ও দোয়া), ২১. হাসীদের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত, ২২. রাসূলুল্লাহ (স.) নামায, ২৩. আদাবে জিন্দেগী, ২৪. শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী, ২৫. আল্লাহর ভয়ে কাদা।

আপনি কি আপনার সন্তানকে সৎ, চরিত্র ও আদর্শবান হিসেবে গড়তে চান?

শিশু কিশোরদের গল্পের বই

নিম্নে উল্লেখিত ২৪টি বই দাম ৩৪১০/- এখন ১৭০০ টাকা

১. আল কুরআনের গল্প, ২. ছোটদের প্রিয় নবী (স.), ৩. হাদীসের গল্প, ৪. ছোটদের মূসা নবী (আ:), ৫. হযরত ওমর, ৬. ছোটদের হযরত আলী, ৭. আবাক সেনাপতি, ৮. ছোটদের শেখ সাদী, ৯. খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ১০. এখনি ফিরে এসো, ১১. ছাত্রদের বলছি, ১২. বিশ্বনবীর উপদেশ, ১৩. ছোটদের আদর্শ মহানবী মুহাম্মদ (সা.), ১৪. হে বোন তোমাকে বলছি, ১৫. চরিত্র গঠনের নামাযের ভূমিকা, ১৬. রহস্যের চাদর, ১৭. পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০টিপস, ১৮. খালেদ বীন ওয়ালীদ, ১৯. স্পেন বিজয়ী মূসা, ২০. গ্রানাডার শেষ বীরের গল্প, ২১. খাদিজা (রা.) ১৫০টি শিক্ষনীয় ঘটনা, ২২. গল্পে গল্পে ছোটদের ৩৬৫ দিন, ২৩. শিকলপড়া হাতের পরশ, ২৪. মাকে খুশি করার ১৫০টি উপায়।

কুরআন, হাদিস, সাধারণ ও ফুলনিম স্কুলীদের জীবন ভিত্তিক রচিত বইগুলো সংগ্রহ করুন।

খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ:) লিখিত ৩২টি বই ৬৫৬০ টাকা এখন ৩২৮০ টাকা

১. ইসলামী আকীদা, ২. রাহে বেলায়াত, ৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ৪. এহইয়াউস সুনান, ৫. খুৎবাতুল ইসলাম, ৬. পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা, ৭. আল ফিকহুল আকবার, ৮. পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা, ৯. আল মাউযুআত, ১০. বাংলাদেশ উশর বা ফসলের যাকাত, ১১. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ১২. আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, ১৩. মুনাজাত ও নামায, ১৪. মাসনুন ওজীফা, ১৫. শবে বরাত, ১৬. কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ, ১৭. জিজ্ঞাসা ও জবাব (১-৩), ১৮. মুসলমানী নেসাব, ১৯. রমজানের সওগাত, ২০. কিতাবুল মুকাদ্দাস, ২১. ঈদে মিলাদুনবী, ২২. হজ্জের আধ্যাতিক শিক্ষা, ২৩. জামায়াত ঐক্য, ২৪. সালাত দুআ ও জিকির, ২৫. সালাতের মধ্যে হাত বাধার বিধান, ২৬. সালাতে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর। ২৭. ফিকহুস সুনানী ওয়ালআসর-১-৩।

নতুন সিলেবাসের আলোকে ৩টি প্যাকেজ

১. কর্মী, তাফহীম ২টি, হাদিস ১টি, সাহিত্য ১৭টি ৮৫০ টাকা
২. সাথী, তাফহীম ১১টি, হাদিস ৪টি, সাহিত্য ৩০টি ৩১৫০ টাকা
সাথী সাহিত্য (পাঠ্য ৩০টি বই) ১৬০০ টাকা
৩. সদস্য, সাহিত্য (পাঠ্য ৭৭টি বই) ৮০০০ টাকা

রুকন (সদস্য) সাহিত্য ৬৮টি বই হাদীস ৪টি ৪৩০০ টাকা

অন্যান্য অর্ডারযোগ্য :

১. তাফসীরে ফী জিলালিল কুরআন ১-২২ খণ্ড ৩২০০, তাফসীরে ইবনে কাসির ১-৮ খণ্ড ৩০০০ টাকা
২. সহীহ মুসলিম ১-৮ খণ্ড ১৯০০ টাকা, তিরমিযি ১-৬ খণ্ড ১৩৫০ টাকা
৩. তাফহীমুল কুরআন-১-১০ খণ্ড, ১-১৯ খণ্ড ৪. কুরআনের পয়গাম ১-৩ খণ্ড
৫. শব্দার্থে কুরআন-১-১০ খণ্ড ৬. শব্দে শব্দে কুরআন-১-১৪ খন্ড
৭. বোখারী ১-৬ খণ্ড

আজই আপনার চাহিদা জানিয়ে অর্ডার দিন আমরা আছি আপনার পাশে

ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিসে বই পাঠানো হয়

ফাহিম বুক ডিপো

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৯৮১-১৪৩১১১, ০১৭১২-২৮৭৬৯৫ (বিকাশ) ০১৯৮১-১৪৩১১১৪ (রকেট)
E-mail: fahimbookdepo11@gmail.com,
FB: Facebook.com/Fahimbookdepo.official

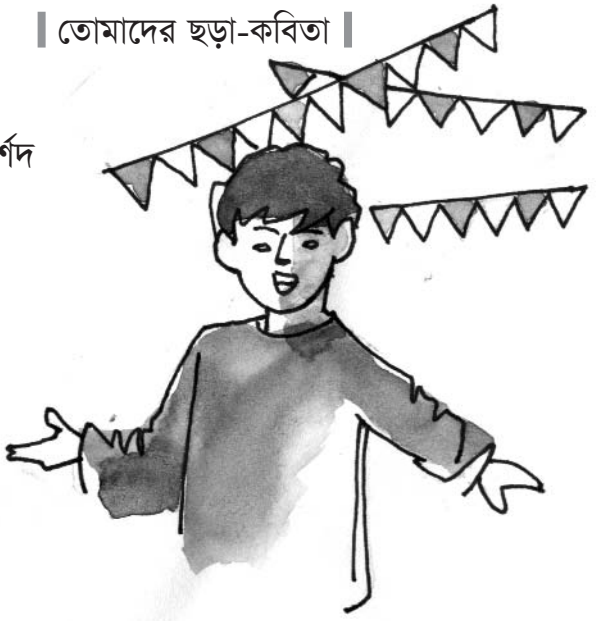

সোনালি প্রভাত

আব্দুল মুহিত মুর্শেদ

পাখিদের গানে আসে
সোনালি প্রভাত
সূর্য মেরেছে উঁকি
চলে গেছে রাত ।

আজানের সুরে সুরে
জেগে ওঠে সব
সালাতের নায়ে বসো
খুশি হবে রব ।

জেগে ওঠে পশুপাখি
জেগে ওঠে ফুল
প্রভুর হুকুমে জাগে
দুনিয়া সমূল ।

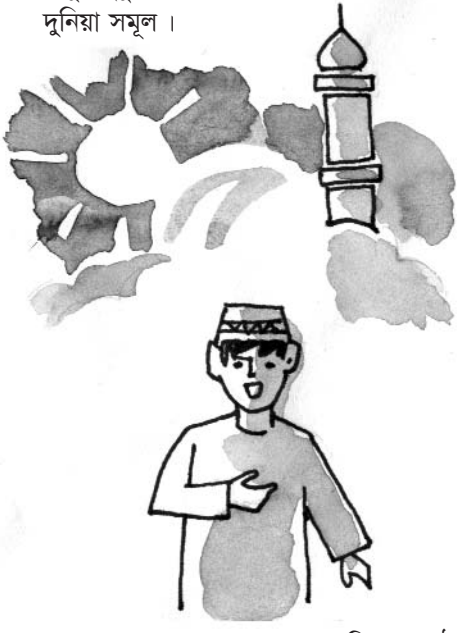

বৈশাখের সুর

জনি সিদ্দিক

পুরান দিনের জড়তা ভুলে
নতুন দিনের হিসাব খুলে
দিচ্ছে আবার ডাক,
সবার মাঝে যাক ছড়িয়ে
ভালবাসায় দিক ভরিয়ে
এবারের বৈশাখ ।
হাসি-খুশি সবাই থাকুক
খুশির আবির সবাই মাখুক
নতুন বছর জুড়ে,
সোহাগ-প্রীতি থাক শুধু থাক
হিংসা বিভেদ যাক দূরে যাক
বৈশাখেরই সুরে ।

নির্ধারিত এ ফরম ছাড়া 'বলতে পারো'র উত্তর দেয়া যাবে না

উত্তরকারীর ঠিকানা

নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

.....

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : .....

শ্রেণী : ..... বর্ষ/বিভাগ : ..... রোল : .....

ফোন : ..... থানা ও জেলা : .....

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

৬. .....

৭. .....

৮. .....

৯. .....

১০. .....

উত্তর পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল ২০২০

০

নির্ধারিত এ ছক ছাড়া 'শব্দ ধাঁধা'র সমাধান গ্রহণ করা হবে না

সমাধানকারীর ঠিকানা

নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

.....

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : .....

শ্রেণী : ..... বর্ষ/বিভাগ : ..... রোল : .....

ফোন : ..... থানা ও জেলা : .....

এপ্রিল ২০২০ সংখ্যার সমাধান

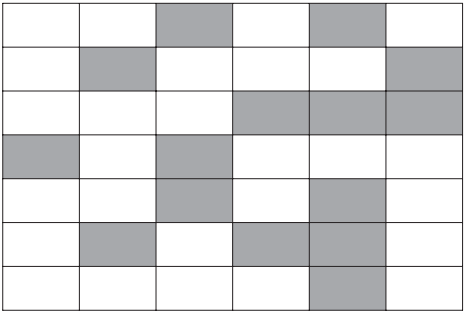

বলতে পারো এবং শব্দ ধাঁধার উত্তর মাঝে কেটে পাঠাও

সমাধান পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল ২০২০

৩৭ বছর ধরে
সাফল্যের শীর্ষে
ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

Your Merit, Our Schooling, Your Admission...

২০১৯-২০ সেশনে ঢাবি'র
খ-ইউনিটে শীর্ষ ২০এ ১০জন
ঘ-ইউনিটে ১ম,৪র্থ,৬ষ্ঠ-সহ
সর্বাধিক শিক্ষার্থীর অবিস্মরণীয় সাফল্য!

ঢাবি'র বিভিন্ন ইউনিটে ফোকাস থেকে চান্সপ্রাপ্ত শীর্ষ-৩ মেধাবী

২০১৯-২০ সেশনে ঢাবির খ ও ঘ-ইউনিটে চান্সপ্রাপ্ত শীর্ষ-২০ মেধাবীদের একাংশ।

আব্দুল্লাহ, তা'মীরুল মিল্লাত | নুরুন্নাহার ঊর্মি, সৈয়দ নজরুল ইস. কলেজ | ঈদুল ফয়সাল, নিজামপুর কলেজ | আ. আল-মাহ্‌দি, ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসা | রিফাহ্ তাসনিয়া, হলিক্রস কলেজ | সাজ্জাদ, তা'মীরুল মিল্লাত

আসিফ ইকবাল, যশোর ক্যান্ট. কলেজ | রেজাউল করিম, নজরুল কলেজ | আসিকুর রহমান, রংপুর সরকারি কলেজ | মুজাহিদ, বাগদি আহমদিয়া মাদ্রাসা | ওয়াহিদুল ইস., ঢাকা রেসিডেন্টসিয়াল | সিদরাতুল মুনতাহা, চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ

ছবি বাণিজ্য নয়, বস্তুনিষ্ঠ প্রচারণাই ফোকাসের মূলনীতি!

ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

২০২০-২১ সেশনে
Advanced Batch-এ
বিশেষ ছাড়ে ভর্তি চলছে..

৯৫ বিটিআই সেন্ট্রাল প্লাজা (২য় তলা),ফার্মগেট,ঢাকা | ০১৭৫০-১৩৮৯৫০